দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ঃ বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা এবং উপস্থাপন রীতি

কুশান

উত্তরবাংলার লোকনাট্যজগতের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাটক কুশান পালা নাটক। কোচবিহার জেলাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ উত্তরবঙ্গে এর প্রসার। পশ্চিম আসামের গোয়ালপাড়া, বাংলাদেশের রংপুর বগুড়া এবং বর্তমান উত্তর বাংলার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার সমগ্র এলাকা জুড়ে কুশান লোক নাট্যের প্রচলন চোখে পড়ার মতো। এই 'কুশান' গানের কুশান শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোক সংস্কৃতি গ্রন্থের লোকনাট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন — "কুশান শব্দটি সংস্কৃত কুশীলব শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। কুশীলবই বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম প্রচারক। মনে হয়, তাই রামযাত্রার আদিরূপ এবং এখন পর্যন্তও তা তার প্রাচীন ধারা অনেকখানি রক্ষা করে চলেছে।"[১] ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর অসমীয়া নাট্য সাহিত্য গ্রন্থে আলোচনা করেছেন 'যে রামের পুত্র লবকুশ, এই কুশ শব্দ থেকেই কুশান গানের উৎপত্তি হয়েছে'[২]।

কুশান গান নিয়ে দীর্ঘকাল যাঁরা চর্চা করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে ভেবেছেন তাঁদের মতামতও অনুরূপ যে লবের ভ্রাতা কুশের নাম থেকেই কুশান শব্দের উৎপত্তি। কুশান-সম্রাট ললিত কুশানী (দিনহাটা), গাড্ডা কুশানী (তুফানগঞ্জ) ৎকা কুশানী (নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ) কাশীনাথ কুশানী (তুফানগঞ্জ), এইসকল বিদগ্ধ পালাকারগণ যাঁদের নিজস্ব পদবীর বদলে 'কুশানী' পদবী হয়ে উঠেছে, তাঁরা সকলেই প্রায় একই মত পোষণ করেন — রামায়ণের গায়ক কুশের নাম থেকেই 'কুশান' শব্দের উৎপত্তি। ড. দ্বিজেন্দ্র ভকত অসমীয়া ভাষায় 'কুশান গান' নামে যে ছোট পুস্তিকা রচনা করেছেন তাতেও এই কথা বলা হয়েছে। 'কুশান শব্দটা সংস্কৃত কুশীলব শব্দর পরা উৎপন্ন হৈছে বুলি পণ্ডিত সকলে ধারণা করে।'[৩] কুশীলব দুই ভাই প্রথম রামায়ণ গান করেছিলেন। সেই থেকে এরকম ধারণা করা হয়েছে। কুশগান থেকে কুশান এসেছে বলে মনে করা হয়। সুকুমার সেন অবশ্য কুশীলব শব্দটিকেই ব্যাকরণ বিরুদ্ধ মনে করেন।[৪]

কুশান শব্দটির অন্য একটি অর্থ দ্বিজেন্দ্র ভকত নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন কোচ রাজাদের সময়েই কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লোকগীতি রাজসমাদর লাভ করেছিল। কোচরাজা রাজ্যের ১২ জন শিল্পীকে বিশেষ সম্মান

জানিয়েছিলেন। সেই সময় রচিত কিছু গ্রন্থে কোচরাজ্যের নাম হয়েছিল কোচান। এই কোচান শব্দটি কোচরাজ্যে প্রচলিত ও জনপ্রিয় রামায়ণ গান সম্বন্ধে ব্যবহৃত হত। দ্বিজেন্দ্রবাবুর শিবানন্দ শর্মার অভিমত অনুসরণ করে বলেছেন কোচান > কুচান > কুশান শব্দের রূপান্তর ঘটেছে। "...রামায়ণগীতক কোচরজা সকলর আমোলতে কুশান নাম দিয়া হয়।"[৫] কুশান শব্দটির অন্য কোনোরূপ প্রকৃতিপ্রত্যয় নিষ্পন্ন করতে না পারলে আপাতত কুশগান বা কোচরাজ্যের জনপ্রিয় গান অর্থে কথাটিকে ব্যবহার করতে হবে। কোচরাজ্যে কুশান গানের ব্যবহারও খুব প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। কুশান গানের মূল বাদ্যযন্ত্র বেনা। বেনা শব্দটি বীনা অর্থ বাচক। সম্ভবত বীণার কোনো লৌকিক রূপই বেনা। দরং বংশাবলীতে উল্লেখ আছে বিশ্বসিংহের রাজ্যাভিষেকের সময় 'রামবেনা' বাজানো হয়েছিল। এ থেকে মনে হয় বেনা যন্ত্রটি খুব প্রাচীন। যন্ত্রটির সরল — তা কতকটা একতারা জাতীয় যন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার থেকে কুশান গানকেও বেশ প্রাচীন বলে মনে করা হয়।

'কুশান' পালা গানে ১৪/১৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে থাকেন। ১৪/১৫ জন শিল্পীর মধ্যে মূল গীদাল, দোহার বা দোয়ারী, ৫ থেকে ৭ জন এবং অন্যান্যরা বাজানদার হিসাবে থাকেন। ছুকরী এবং মূল গীদালের দক্ষতা ও শৈল্পিক কৌশলের উপর নির্ভর করে চলে কুশান গান। ফলত মূল গীদালের নামানুসারের গানের দলের পরিচিতি লাভ করে। যেমন ঝাপরা কুশানি, ললিত কুশানি, ওকা কুশানি, গোবিন্দ কুশানি (রংপুর) এই সকল বিদগ্ধ শিল্পীদের নামের সঙ্গে কুশানের পরিচিতি রয়ে গেছে। তাই এই নাটক উপস্থাপনে মূল গীদালের ভূমিকাই প্রধান। মূলের হাতে 'বেনা' নামক ছোট তৈরী বাদ্যযন্ত্র থাকে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত পরিচ্ছন্ন চেহারায় আসরে উপস্থিত থাকেন মূল গীদাল।

এই পালাগানে মূল গীদালের অপরিহার্য সঙ্গী দোয়ারী। হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অর্থের গভীরতা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে কাহিনীকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি নর্তকীদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দেওয়া — প্রভৃতি কাজে দোয়ারীর ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে। হাঁটুর উপরে ধুতি অত্যন্ত সাধারণ শার্ট বা গেঞ্জি এবং গামছা দোয়ারীর জন্য নির্দিষ্ট পোষাক। অভিজ্ঞ দোয়ারীদের নাম মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। এই পালাগানেও দোয়ারীদেরও বৈরাগী বলা হয়। তুফানগঞ্জের চুড্ডা বৈরাগী, কোচবিহারের বড়শালবাড়ির হেসকারু দোয়ারী, রংপুরের বেন্দাবন দোয়ারীদের নাম বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

পাঁচ-ছয়জন ছুকরী নর্তকীদের মধ্যে ডায়না ছুকরী এবং সহকারী ছুকরী অন্যান্যদের পরিচালনা করে থাকেন। সুন্দর চেহারার ছেলেরাই মেয়েদের সাজ পোশাকে সুন্দরী মেয়েরূপে সেজে উঠতেন। বর্তমানে মেয়েরাই নর্তকীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছেন। অভিনয়, গীত এবং নৃত্যে এঁদেরকে পারদর্শী হতেই হবে। ছেলেরা শাড়ি, ব্লাউজ, কৃত্রিম স্তন, পরচুলা, পাউডার, পিউরি, আলতা, কাজল ইত্যাদি দিয়ে নিজেদেরকে সুন্দর তরুণীরূপে

সজ্জিত করে থাকেন। প্রায় বিশ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে মেয়েরা নিজেরাই এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করছেন। ললিত কুশানি নিজে তাঁর মেয়েদের এই পালাগানে এনেছিলেন। মেয়েরা যেখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন সেখানে সাজ সজ্জার ব্যাপার অতো উগ্ররূপে ধরা পড়ে না। গ্রামের গরীব ঘরের মেয়েরাই সাধারণত এই পালাগানে যোগ দিয়ে থাকেন।

কুশান গানে যাঁরা খোল বা মৃদঙ্গ বাজান তাঁদেরকে বাইন বলা হয়। ডায়না বাইন, বাঙ্গা বাইন অর্থাৎ সহকারী বাইন — এই দুইজন খোলবাদক অসম্ভব কলা-কৌশলে খোল বাজিয়ে চলেন। নৃত্য যেমন নিয়ন্ত্রণ করেন তেমনি খোল-বাজনাদারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পালন করেন। এঁদের সঙ্গে থাকেন বাঁশীদার, জুড়িদার, পালি (দলগায়ক) এবং সারিন্দা বাদক।

কুশানগানে বেনাই হলো মুখ্য যন্ত্র। সেইজন্য কুশান গানকে কোনো কোনো জায়গায় বেনা গানও বলা হয়ে থাকে। এই যন্ত্রটি তৈরী করতে পূর্বে ঘোড়ার চুল ব্যবহার করা হতো। এখন ঘোড়ার চুলের পরিবর্তে সূক্ষ্ম ইস্পাতের তৈরী তারের ব্যবহার দেখা যায়। এই বেনা যন্ত্রটি কুশানগানের মূলগীদালই ব্যবহার করে থাকেন। পরম্পরাগতভাবে শিক্ষার্থীরা এর ব্যবহার শিখে পরবর্তীতে মূল গীদাল হয়ে ওঠেন। বেনা যন্ত্রের সুর কোমল এবং মধুর। নিবিড় মনোনিবেশে এবং আধ্যাত্মিক উচ্চ-ভাবনায় নিয়ে যেতে বেনা যন্ত্রের সুর সাহায্য করে। এই পালাগানে মঞ্চ পরিকল্পনা বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তিতরূপে দেখা দিয়েছে। তিরিশের দশকে মঞ্চ-সজ্জায় ছিলো খোলা মঞ্চের চারদিকে চারটি কলাগাছ এবং মাঝখানে বিছানা। এই বিছানায় থাকতো ছেড়া চট, খড় , শত রঞ্চি বা ত্রিপল। চারদিকেই দর্শকরা মাটিতে খড়ের বিছানায় আসন গ্রহণ করতেন। বাজানদারগণ বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে আসরের মাঝখানে বসতেন। সেই সময় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার করার সুযোগ থাকতো না। প্রথমদিকে চারদিকে চারটি মশাল জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হতো। চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে কিংবা হ্যারিকেন জ্বালিয়েও রাতের পর রাত গান হতো। কিছুদিন পরে এলো হ্যাজাগের আলো। হ্যাজাগের আলো থেকে দিনের মতো পরিষ্কার আলো করার জন্য প্রবর্তন করা হলো ডে-লাইট। ডে-লাইটের ব্যবহার বহুদিন পর্যন্ত ছিল। মাইক্রোফোনের কোনো ব্যবস্থাই থাকতো না। শিল্পীগণ খালি গলায় উচ্চরবে গান ধরতেন। মূল গীদালের উচ্চনিনাদ মঞ্চের আকাশকে গম্ভীর করে তুলতো।

পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহজে গ্রহণ করার ফলে মঞ্চ পরিকল্পনার মূল কাঠামো ঠিক রেখে অন্যান্য পরিবর্তন গ্রহণ করা হলো। হ্যাজাগ লাইটের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার চলে এলো। সাউন্ড-সিস্টেমের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়লো। পূর্বে সারারাত ধরে এই অনুষ্ঠান চলতো। বর্তমানে তা করে এসে ৪ - ৫ ঘন্টায় ঠেকেছে। পালা শুরু হওয়ার কিছক্ষণ পূর্বে মূল গীদাল, দোয়ারী, নর্তকীগণ আসরে প্রবেশ করেন। বাজানদারদের বাজনা আগে থেকেই চলতে থাকে। আসরে প্রবেশ করে মূল গীদাল আসর বন্দনা

করেন। 'কুশান' গানের কাহিনী মূলত: রামায়ণ থেকে নেওয়া হয় বলে আসর বন্দনায় রামের মাহাত্ম্য যুক্ত করে আসর বন্দনা করা হয়।

দিনহাটার ললিত কুশানীর আসর বন্দনায় প্রথম বন্দনাতে পাই

রামং লক্ষ্মনং পূর্বজনং রঘুবরং
সীতা-পত্নি সুন্দরম
করুনামরং গুণানিধিং বিপ্র-প্রিয়ং ধার্মিকং
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথ ময়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকভিরামং
রঘুকুল তিলকং রাঘবং
রাবণ অরিম

(ললিত কুশানীর দ্বারা যে-ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে সেই ভবে লেখা হলো)

মূল এই সংস্কৃত শ্লোক মায়াময় সুরেলা কণ্ঠে সমস্ত শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেন। তারপরেই নৃত্যের তালে তালে আসর বন্দনা। শ্লোক শেষ হতেই আবার লম্বা টান —

জয় আহা - হা - হা
দক্ষিণে লক্ষ্মণ বন্দি
বামেতে জানকি শোভা
পুবেতে মারুতির্যস্য
তং নমামি রঘুত্তমম
রামচন্দ্র রামভদ্র বেধসে
রঘুনাথায় সীতায়াঃ পতয়েঃ নমঃ নমঃ

কুশান গান গাইতে গেলে প্রথম এই দুই স্তবক গাইতে হবেই।

তারপর রাম বন্দনা —

ব্যানা হাতে লইয়া প্রভু
লইলাম তোমার নাম
এই আসরে এসে প্রভু
দাও দরিশন
গাইব কুশান গান
মনোতে বাসনা
দয়া করে এসে প্রভু
পুরাও কামনা।

এই বন্দনার শেষে 'জয় আহা-হা' হাঁক দেওয়ার সময় গীদালের সঙ্গে অন্যান্য সকল শিল্পী সুর ধরেন। ঠিক এই জায়গাতে শুরু হয় সরস্বতী বন্দনা —

ধুয়া — মায়ের নাম লইয়া দারাইলাম আসরে
ও দয়া কর ওহে মা জননী

পদ — ও - মা - গো
আইসেক মা মোর সরস্বতী
রথে করিয়া ভর
জৈ-জোগারে নামেক মা তুই
মোর সভার ভিতর
মোর সভা ছারিয়া যদি মা
অইন্যের সভায় যাইস
আরো কিছু কিরা না দোং মা
ধর্মের মাথা খাইস
পাইল বাইনের মস্তকে মা
থুইয়া দুই পাও।
শ্যালক মুনির কণ্ঠে আসি মা
নেওয়ালি খেলাও।
নেওয়ালি খেলাইতে যদি মা
এক পদো নড়ে
তুইও লজ্জা পাবু মা
দেবেরো সভাতে।

(ড. দ্বিজেন্দ্র ভকত-এর সংগৃহীত 'কুশান' পালা থেকে এই গানটি সংজ্ঞা করা হয়েছে।)

কুশান পালাগানের 'বন্দনা'র গুরুত্ব অত্যাধিক। রামায়ণের মাহাত্ম্য এবং ভাব-পরিবেশ তৈরী করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা রক্ষা করে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বন্দনা' অংশ পরিবেশিত হয়। সরস্বতী বন্দনার পর চারযুগের বন্দনা করা হয় —

হরি করিলেন নীলা চমৎকার
হরি তোমার নীলা বুঝা ভার
সত্যযুগে ছিলেন হরি
ত্রেতায় সে রাম ধনুর্দ্ধারী
দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ ধরি
রামনাম প্রভু নাম রাজীব লোচন,
দয়া করো রঘুনাথ প্রভু বন্দিলাম চরণ।
তব নাম স্মরণ করি বীণা লৈলাম হাতে
দয়া করো দয়াময় প্রভু অধম জনাতে।

চারযুগ বন্দনা শেষ হলে মূল গীদাল এবং দোয়ারীর কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলে। মূল গীদালের গম্ভীর কথাকে দোয়ারী হাল্কা করে দর্শকের সামনে ব্যাখ্যা করেন। রামায়ণের বিভিন্ন পালার মধ্যে কোন অংশটি গাওয়া হবে দোয়রী মূলের এবং দর্শকের অনুমতি নিয়ে তা ঘোষণা করে দেন। সংগৃহীত লক্ষ্মণে শক্তি শেল'-এর কাহিনী শুরু হয়েছে 'প্রার্থনা' অংশ দিয়ে।

প্রার্থনা শেষ হলে দোয়ারী বা বৈরাগী হাল্কা চালে গদ্য-সংলাপে মূল গীদালের সঙ্গে বাক্য বিনিময় শুরু করেন—

বৈরাগী — এইযে জুড়িল কোতোন, আর মন্দোদরীর কোতোনোতে রুষিল রাবণ।

মূল — আরে কুলোক, কোতোন কি রে ?
আরে কোতোন নোয়ায়রে ক্রন্দন
দেখ দোয়ারী, এই আসরে উঠতে উঠতে
যে কাউরহাটি — এমনটা কিন্তুক ভাল নোয়ায়

বৈরাগী — আচ্ছা ন্যাও ন্যাও, কাউরহাটি না করি, হ্যা তোমারে মুখখান বোল অশুদ্ধ,
মিছাঁও খালি ফাও ফ্যাচাল।

এইরূপ সংলাপ চলতে চলতে নর্তকীদের মধ্য থেকে একজন সীতার চরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। কিছু কথা এবং কান্না মেশানো গান দিয়ে সীতা রাম-বিচ্ছেদ-বেদনার কথা প্রকাশ করতে থাকেন। পালাগান এখান থেকেই নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করে। আসরে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করে থাকেন। মূল গীদাল এবং দোয়ারী এই ভিন্ন চরিত্রের অভিনয় সবচেয়ে বেশী করে থাকেন। ফলত কাহিনীর ঘনবদ্ধতা, অগ্রগতি এবং পরিণতি সবটাই নির্ভর করে এই দুই শিল্পীর উপর।

কুশান পালা নাটকের নাটকীয় কথা-কৌশলের মধ্যে নর্তকীদের নৃত্য পরিবেশন সমস্ত কিছুতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বন্দনা থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত নৃত্য চলতে থাকে। বিভিন্ন তালে নৃত্য শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। একতালা সুরে তাল ধীরে শুরু হবে। দোতালে আর একটু ঘনমাত্রায় নৃত্য প্রকাশিত হবে। তেতালে ক্রমশ: দ্রুততা বৃদ্ধি পেয়ে চৌতালে দ্রুত লয়ে পৌঁছে যাবে। এই দ্রুত তাল আরো তীব্র গতিতে প্রকাশ পাবে 'দশকুশি' তালের মধ্যে। ললিত কুশানী তাঁর শিল্পীদের সংখ্যা দিয়ে নাচের তালিম দিয়ে থাকতেন। তিনি বলেন ৬ মাত্রার ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ করে নৃত্য দ্রুত লয়ে চলে যাবে। নৃত্য শিল্পী প্রথমে ডান হাত উপরে তুলবেন। সেই সময় বাম হাত বুকের মাঝখানে আসবে এবং পরে উপরে উঠে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত বুকের মাঝখানে চলে আসবে। এই দুহাত ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে শরীরকেও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বাঁকিয়ে নেওয়া হয়।পা-এর ক্ষেত্রেও প্রথমে বাঁ পা এগিয়ে যাবে এবং তারপর ডান পা বিভিন্ন তালের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এগিয়ে চলবে।

এই দ্রুততালের নাচ থেমে গেলে পালাগানের মূল গীতল কবিতার আকারে দোয়ারীর প্রতি বিশেষ একটি পদ ছেড়ে দেন। দোয়ারী পদ ব্যাখ্যা করেন প্রয়োজনে পদের উপর মূলের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। এই চলমান বিষয়টির সময়েও বাজনা কখনো স্তিমিত হবে না। ধীর লয়ে চলতে থাকবে এবং নর্তকীরাও ধীরে ধীরে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে গোলাকারভাবে স্থান পরিবর্তন করতে থাকেন।

নাটকের শেষে এসে মূল সর্বশেষ হাঁক দিয়ে বলেন —

এবার রাম নাম বলো
দিন যায় বইয়া
রাম বলো হরি বলো
মুকুন্দ মুরারী
লক্ষ্মণ ঠাকুর প্রাণ পাইলো
বলো হরি হরি।

এই গানের সুরে সুরে নর্তকীরা এবং দোয়ারী নেচে নেচে কুশান পালা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটান। কুশানগানের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের পরিবেশন দেখে লক্ষ করা গেছে যে গত ২৫-৩০ বৎসর থেকে এই গান বা পালানাটকের মধ্যে যাত্রার কিছু ঢং ঢুকে গেছে। এটা হয়তো পালা বদলের হাওয়ার প্রকাশ। তথাপি কুশান পরিবেশনের যে মূল পরিকল্পনা এবং আঙ্গিক তা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এর ফলেই অন্যান্য পালা-নাটকের সঙ্গে কুশান পালা-নাটককে আলাদাভাবে চেনা যায়।

কোচবিহার, রংপুর, গোয়ালপাড়া এবং জলপাইগুড়ি জেলার নেতৃস্থানীয় পালানাটক 'কুশান'-এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বে পাশাপাশি কুশানের ভিন্ন ভিন্ন দলের অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রতিযোগিতার লড়াই

চলতো। যা থেকে আঞ্চলিক 'নড়ক' শব্দ প্রচলিত হয়েছে। কোচবিহারের দেওয়ানহাটের কাশী গীদালের সঙ্গে দিনহাটার গোসানীমারির ললিত কুশানীর প্রায়ই 'নড়ক' চলতো। কাশী গীদাল দোতরা যন্ত্র দিয়ে কুশান গান করতেন। ললিত কুশানী 'বেনা' যন্ত্র দিয়ে গান করতেন। দোতরা দিয়ে একমাত্র কাশী গীদালই গান করতেন। কুশানে সাধারণত 'বেনা' ব্যতীত দোতরার ব্যবহার দেখা যায় না। কাশী গীদালই ব্যতিক্রম ছিলেন।

দিনহাটার পেটলাতে এই দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বি মূলের 'নড়ক' চলছিলো তিনদিন তিন রাত্রি ধরে। শেষে থেমে গিয়েছিলো নেহেরুর মৃত্যু সংবাদে। এই কাহিনীটি কুশান নাট্যজগতে কিংবদন্তী হয়ে আছে। ঝাপুরা কুশানী, ললিত কুশানী, কাশীগীদাল থেকে শুরু করে বহু নামী নামী শিল্পী 'কুশান' পালাগানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ বর্তমানে এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

একটি কুশান পালার পর্যালোচনা ঃ

কুশান গানের বিষয় রামায়ণের কোন কাহিনী। রামায়ণের বাইরে এ পালায় কোনো কাহিনী গীত বা অভিনীত হয় না। রামবনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ইত্যাদি পালা কুশানের জনপ্রিয় পালা। এর আদিরূপ যখন কোচরাজ্যে প্রচলিত হয় তখন রামায়ণ কথাকে এই লোকশিল্প মাধ্যমের দ্বারা জনপ্রিয় করে তোলা এর একটি সম্ভাব্য লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। সেজন্য এই মাধ্যমে রামায়ণ কথাকেই অবিকল গ্রহণ করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে লোকনাট্যের আদিরূপও গানের মধ্যেই নিহিত ছিল। কুশান এখনো গান হিসেবে পরিচিত, দোতরা এখনো গান। এই গানের সঙ্গে নৃত্য যোগ করে তাকে কিছুটা নাটকি চেহারা দেওয়া হয়েছিল। গান মনকে ভাবের জগতে নিয়ে যায় আর কথা তাকে বাস্তব জগতের মাটিতে নিয়ে আসে। নৃত্য সুরকে রূপময় করে তোলে। দেহলীলার নানা ভঙ্গিতে সুর ও ছন্দ সেখানে মূর্তি লাভ করে। সঙ্গীত আর নৃত্যের সহযোগে রামায়ণ গান তাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গীত আর নৃত্যের এই যুগলরূপের মধ্যে নাট্যধর্ম প্রকট হয়নি। যতদিন না তা কথারসে পুষ্ট হয়ে ওঠে। রামায়ণের কাহিনীতে আছে গল্পরস। সেই গল্পরস সঙ্গীতের মাধ্যমে বলা আর নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করার ভিতরে জাগে এই লোকনাট্যের আদিমতম রূপ। ক্রমে ক্রমে আখ্যান গানের ভিতর থেকে কথকতার ভিতরে নেমে আসে। রামায়ণ কথাকে এদেশে নানা মাধ্যমের দ্বারা রূপায়িত করা হয়েছে। লোক-ফর্মের মাধ্যমে যখন রামায়ণ গানকে জনসাধারণের সামনে প্রচার করা শুরু হল তখন তারই ভিতর থেকে ক্রমে একটু একটু কথা জেগে ওঠে। সে কথা আখ্যানেরই ব্যাখ্যান। গানে যে কাহিনী বলা হল গদ্যে হল তার ব্যাখ্যা। তাকে বলা যায় কথকতা। আর যখন গানের কথাকে অভিনয়ের রূপ দেওয়া হল তখন তা হল নাট্য। একসময় লোকনাট্যের নাট্যরূপায়ণ হত গানে। উক্তি প্রত্যুক্তিও হত সংগীতের মাধ্যমে। আর চরিত্রগুলির নৃত্য ছিল তার সঙ্গে সর্বাত্মক ভাবে জড়িত। কীর্তনগানের যে রূপ বর্তমানে প্রচলিত, তাতে মৃদঙ্গ

বাদ্য ও মূল গানের গায়ক এবং দোহার সকলেই নৃত্য করেন। আবার এই কুশান গানে নৃত্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো বা গানের সঙ্গে মুখ্য রূপে মঞ্চের সম্মুখে এসে, আবার কখনো বা গানকে প্রাধান্য দিয়ে তার সহযোগীরূপে পার্শ্বে থেকে — হয়েই চলে। তার বিরাম থাকে না।

প্রথম যুগের কুশান গানের রূপ ছিল গীতিনৃত্যময়। সেই নৃত্যগীতের মধ্যে ক্রমে সাঙ্গীতিক সংলাপ কাহিনীসূত্রের যোজকরূপে সংযোজিত হয়ে তার নাট্যিকরূপের সূচনা করে। এই সাঙ্গীতিক সংলাপ থেকে ক্রমে জেগে ওঠে গদ্য সংলাপ। কিন্তু অভিনয়ের দ্বারা রূপময় হয়ে ওঠার চেয়ে কাহিনীর যোজকরূপেই তার কার্যকরিতা দেখা যায়। কুশান গানের পূর্ব রূপের আলোচনা করতে গিয়ে যারা কথা বলেছেন, তাঁদের লেখায় দেখি সেখানে গানই সংলাপের ভূমিকা পালন করত। আর দ্বিতীয়ত যা এখনো আছে — আগে তাই একমাত্র ছিল — মূল ও দোয়ারি দু'জনেই তা নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন। মূল গীদাল সবরকম ভূমিকা পালন করতে পারতেন। তিনি একই সঙ্গে গান নাচ ও অভিনয়ে দক্ষ। আর তারই মতো দক্ষ হতেন দোয়ারি। দোয়ারির কাজ ছিল গানের কর্তাকে ব্যাখ্যায় নামিয়ে এনে লোক সাধারণের পক্ষে তাকে সহজবোধ্য করে তোলা। দোয়ারি মূলগীদালের উল্টোপিঠ। সে এখানে লোক সাধারণের প্রতিনিধি। গীতির বিপরীতে তার কথা। তাই তার পোষাক পরিচ্ছদও অত্যন্ত সাধারণ। অন্যদিকে গীদাল ও দোয়ারি দুজনেই একই গানের সঙ্গে গলা মেলান একই সঙ্গে নৃত্য করেন। প্রাচীন গীতি পরিবেশনের এই রূপ। গান একলার হলেও তাতে গলা দেবেন অন্যান্যরাও — নৃত্য করবেন সকলে। এদিক থেকে দেখা যায় গানের রূপই তাতে প্রচ্ছন্ন। আর সেই গানের রূপ যখন কথার সাহায্যে কিঞ্চিৎ দ্বন্দ্বময় হয়ে প্রকটিত হয় তখন তার নাট্যরূপ ব্যক্ত হয়।

কুশানগানে রামায়ণ কথাই মূল — সেকথা আগে বলেছি। এখন কীভাবে একটি কুশানপালার রামায়ণের একটি আখ্যান পরিবেশিত হয় তার কথা বলছি। আমরা এখানে লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালাকে অনুসরণ করে এই বিবরণ দেব। লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা শুরুর আগে দেবদেবীর বন্দনা ও রাম বন্দনা একটা সাধারণ রীতি। এই বন্দনা পালার যেমন রামস্মরণের দ্বারা প্রবেশ ঘটে, তেমনি দর্শক শ্রোতার মনে একটা প্রগাঢ় রাম ভক্তির উদ্রেকের সূচনা হয়। বন্দনা গানের পর মূল গীদাল যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পতনের কথা দিয়ে পালা শুরু করেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ রাবণকে কেউ দিতে সাহস করছেন না। তাই একজন ভগ্নদূতকে প্রেরণ করা হল। ভগ্নদূতকে প্রেরণ করা হল একটি দৃশ্যে। পরের দৃশ্যে রাবণের বিলাপ ধ্বনিত হল।

নর বানরের হাতে বীরশূন্য লঙ্কাপুরী
বীরপুত্র মোর হল নিহত

তখন এলো ভগ্নদূত। ভগ্নদূত আসরে গিয়ে স্বাগত ভাষণে (রাবণ চিন্তা করতে লাগল) জানাল নিজস্ব ঢং-এ রামের প্রতাপে লংকার দুরবস্থার কথা।

বাপরে বাপ কি হলো বাপ
কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াই —
দুই বেটা জুটিল আসি
মজাইল লঙ্কা আসি
ঐ বেটা প্রাণে মরুক, আমি যেন সুখে থাকি।

এরপর রাবণ তাকে জিগ্যেস করলো — বল বল দূত রণের কিবা সংবাদ !

দূত জানালো ইন্দ্রজিৎ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে।

রাবণ পুত্র শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। যাকে বলেছি দৃশ্য সেরকম কোনো বিভাজন কিন্তু এ নাটকে নেই। কেবল বর্ণনার সুবিধের জন্যই বলেছি। রাবণের মূর্ছিত হয়ে পড়ার পর কাহিনী যোজকের ভূমিকায় এলেন গীদাল। তিনি বলে দিলেন রাবণ অনেক অনেক কষ্টে চেতনা ফিরে পেলেন। এবং তখন রাবণ নিজেই খেদ করতে লাগলেন। রাবণের এই খেদ প্রকাশ অনেকটা স্বগত সংলাপে। রাবণ চলে যাবার পর আবার গীদালের সংযোজনায় শুনি মন্দোদরী ও অন্য অন্তঃপুরিকাদের বিলাপের সংবাদ। তাকে নাট্যরূপে দেখানো হয় গীদালের সংযোজনার অব্যবহিত পরে। সেখানে মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণের কথোপকথন হয়। রাবণ জানিয়ে দেন তিনি এই ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর মূল যে কারণ সেই সীতাকে বধ করবেন। মন্দোদরী রাবণের এই ক্রোধোন্মত রূপের প্রতাপে কিছুটা বিমূঢ় হলেও পরক্ষণেই কর্তব্যস্থির করে ফেলেন।

স্বামী চলে গেল সীতারে বধিতে
না না আমি তা করতে দেব না

এরপর মূল গীদালের গানের যোজনায় পাই রাবণের সীতা বধ করবার জন্য অশোক বনে যাবার কথা, সীতার ভয়ার্ত ক্রন্দন, রামের কাছে রক্ষার আবেদন। এবং পরক্ষণেই পাগলিনী বেশে মন্দোদরী প্রবেশ করে রাবণকে নিবৃত্তকরেন। রাবণ যখন প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গ তুলে বলছেন —

তোকে আনি সর্বনাশ হল লঙ্কাপুরে।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া তোমারে।

তখনই পাগলিনীবেশে মন্দোদরীর প্রবেশ বেশ নাটকীয় হয়ে ওঠে। রাবণের সীতাবধের উদ্যম কে মন্দোদরী ঔচিত্য-শাসিত করে বলে "তোমার এ নারী বধ না হয় উচিত।" ক্রোধী রাবণের এই উদ্যম ও মন্দোদরীর চেষ্টায় সেই উদ্যমের রাশ টেনে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া মধ্যে লোক শিল্পীর নাট্যধর্ম পরিস্ফুট হয়েছে। এরপর

রাবণের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ আমরা পাই মূল গীদালের মুখে।

সিংহনাদ ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পালা যতেক কপিগন।।

আর তারই সমান্তরাল একটি দৃশ্য যেন অভিনীত হয় রাম শিবিরে :

রাম। মিত্র বিভীষণ
আজিকার রণ-কৌশল কি করিছে রাবণ ?

বিভীষণ। শুন ওহে মিত্রবর
দশানন আসিতেছে করিতে সমর।

আমাদের চোখের সামনেই এই দৃশ্যটুকু অভিনীত হয়। রাবণের যুদ্ধযাত্রার কথা শুনে রাম খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আর রামের এই উদ্বেগের মুখেই প্রবেশ করেন রাবণ। যদিও কৃত্তিবাসের অনুসরণে রাবণের সংলাপে ফুটে উঠেছে একটা আত্মসর্ম্পণ করবার মনোভাব এবং তা এই নাট্য প্রকৃতির পক্ষে একটু ক্ষতিকরও বটে — তবু রাবণ এই আত্মগত ভাবালুতাটুকু কাটিয়ে পরক্ষণেই যুদ্ধ করবার মনোভাব নিয়ে জেগে উঠেছে।

হে জটাধারী রাম মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

যুদ্ধে রাম মূর্ছিত হয়ে পড়লে নাটকীয়ভাবে এসেছে লক্ষ্মণ

ওরে দশানন
আমি তোরে পাঠাইব শমন ভবন

যুদ্ধে শেষপর্যন্ত লক্ষ্মণকে শেল বিদ্ধ করে রাবণ ফিরে গেছেন।

যদিও কাহিনীতে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই, তবু অঙ্ক বিভাজন করতে হলে বলতে হয় এই পর্যন্ত এ নাট্যরূপের প্রথম অঙ্ক। লক্ষ্মণকে শক্তি শেলে বিদ্ধ করে এ নাটকের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে। এরপর রাম শিবিরের কাহিনীই গল্পের মূল বিন্দু। লক্ষ্মণকে শক্তিশেল থেকে বাঁচিয়ে তুলতে সেখানে যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তারই নানা দৃশ্যাঙ্কিত রূপ। এই পর্যায়ের কাহিনীর মধ্যে মূল রামায়ণের অনুসরণ হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আর সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের দ্বারা দেখানো হয়েছে কীভাবে লক্ষ্মণকে শেলমুক্ত করা হল। সুষেণের কথায় রাম হনুমানকে ঔষধ আনতে পাঠালেন গন্ধমাদনে। রাবণ একথা জানতে পেরে কালনেমিকে পাঠালেন হনুমানকে নিরস্ত করতে। হনুমান আঠারো বছরের পথ একরাত্রে গিয়ে ঔষধ নিয়ে ফিরে আসবে। সে বেশ অহংকৃতভাবেই বলে গেল।

রাত্রিতে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ

মূল গীদাল এরপর সংযোজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের জানিয়ে দেন হনুমান কীভাবে মহানন্দ করে আকাশে উঠে গন্ধমাদনে যাত্রা করল। আর এই শব্দে সচকিত হয়ে রাবণ বোঝেন হনুমান বিশল্যকরণী আনতে যাচ্ছে। রাবণ বলে ওঠেন —

কোন মতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে

রাবণ কালনেমিকে স্মরণ করেন, যুক্তি বলেদেন এবং লংকার অর্দ্ধেক ভাগ দেবেন বলে কালনেমিকে প্রলুব্ধ করেন। এই সব হয়েছে পারস্পরিক কথোপকথনে। যদিও সে কথোপকথন পদ্যের ছাঁদে রচিত এবং রামায়ণেরই হুবহু অনুসরণ, তবু গীতিনাট্য হিসেবে তার মূল্য কম নয়। পদাই এখানকার সংলাপ। কিন্তু পদ্যের সমুদ্রের ভিতর থেকে ফুটে উঠছে নাট্যধর্মের স্থূল বিভাগ। এরপর মূলের যোজনায় গন্ধমাদনের চিত্র এবং কালনেমি হনুমানের কথোপকথনে তার নাট্যপরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। কালনেমির মৃত্যু হলে রাবণ সূর্যকে উদয়াচলে পাঠালেন।

রাবণ। শুনহে ভাস্কর, উদয় হওগিয়া গিরির উপর...

সূর্য। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে
এখন উদয় বল হইব কেমনে ?

রাবণ। তাতে ক্ষতি কি তোমার
ও, মনে বুঝি শক্তিহীন চিন্তহ আমায়!

সূর্য। হে লঙ্কেশ্বর তব আদেশ পালন করিতে
উদয় হইতে যাই উদয় পর্বতে।

সংলাপের পদ্যের ব্যবহার নাট্যগত ক্রিয়ার রূপায়ণে যেন প্রত্যক্ষতা হারিয়ে ফেলে। তবু লোককবি রামায়ণের পদ্যকে যেভাবে সংলাপের রূপ দিয়েছেন তার মধ্যে সংলাপের জোর অনেক সময় অনুভব করা যায়। রাবণের সংলাপের মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের পদ্য। তাকে সংলাপের মতো ব্যবহার করার মধ্যে পদ্যরূপের সাঙ্গীতিক গুণ কাটিয়ে অমিত্রাক্ষরের জোর সঞ্চার করতে হয়েছে। এই সব সংলাপের মধ্যে ও মনে বুঝি শক্তিহীন চিন্তা আমায় বেশ সংলাপের জোর পায়। এরকম মিলযুক্ত পদ্যময় সংলাপ উনিশ শতকের প্রথম দিককার বাংলানাটকেও বিরল ছিলনা। তার চেয়ে বড় কথা লোকনাট্যে একাধারে সঙ্গীতের ধর্ম বজায় রাখতে এবং নাটকের রূপ নির্মাণ করতে হয়েছে। কাজেই নাটকের সংলাপও যেমন দৃঢ় হতে পারেনি তেমনি তাকে গানের ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করাও লোকনাট্যের কাজ নয়। সেই কারণে এই লোকনাট্যের আঙ্গিকে একই সঙ্গে পাত্র পাত্রীর কথোপকথন

যেমন নাট্য ধর্মী হয়ে ওঠে তেমনি থাকে সংযোজকের ভূমিকা। মূল গীদাল উপস্থাপনা করেছিলেন ইন্দ্রজিতের মৃত্যু দিয়ে আর সেই গীদালই এই লোক গীতিনাট্যের শেষ করলেন লক্ষ্মণের জীবন দান করে। এই উপস্থাপন আর পরিণতি দুয়ের দ্বন্দ্বেরও একটা বিপরীত চরিত্র থেকে যায়। উপস্থাপনা রীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা আগে বলা হয়েছে। এখানে শুধু আঙ্গিকের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলব। আগে এই আলোচনায় সে কথা এসেছে। এই লোকনাট্যের উপস্থাপনার সেই রীতিটি হল প্রথমে কাহিনী বর্ণনা - গীদাল সেই বর্ণনা করছে গানে তারপর সেই গীতখ্যানের অভিনেয় উপস্থাপনা হচ্ছে। উপস্থাপনা রীতির দিক থেকে উনিশ শতক / বিশ শতকের কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকটায়ও যে ধরণের কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত ছিল — তার রূপ এখন প্রায় লুপ্ত। সেই কৃষ্ণযাত্রায় এই আঙ্গিকের অনুসরণ ছিল। বাল গোপাল-রূপী একটি বালক গায়ক প্রথমেই গানে যে কথা বলে যেত — পরে সেই গানের কথাই নাট্যরূপে দেখানো হত। নাট্যাংশ গীতাংশের রূপায়ণ মাত্র। রূপগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখলে বলা যায় লোক কবিদের আঙ্গিক ভাবনার একটা স্বাভাবিক স্বরূপ আছে। কুশান পালা গানে পদ্য যেমন গানের সুর দিয়ে গাওয়া হয় তেমনি তার মাঝে মাঝে কিছু গীতও গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন অশোক বনে রাবণের উদ্যত খড়্গের নীচে ভয়ার্ত সীতার আর্তি সঙ্গীতের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

কোথা প্রভু রঘুনাথ তুমিহে অনাথের নাথ
ও প্রভু রঘুনাথ হে
দেবর লক্ষ্মণ কোথা, না শুনিনু তার কথা
প্রভু প্রাণ যায় আজি রাক্ষসের হাতে
ও প্রভু রঘুনাথ হে।।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়লে লোক কবি রামের বিলাপকে সঙ্গীতের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন

ও - ও - মোর গুণের ভাইরে, ভাই লক্ষ্মণ রে

পরের কথাগুলি রামায়ণের কিন্তু গানের যে situation-এ করুণ রস মানুষের চিত্তকে আর্দ্র করে দিতে পারে সেই সুযোগকে কবিরা সঠিক ভাবেই ব্যবহার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে ভগ্নদূতের মুখের কথাগুলিকে গান করেই দেখানো হয়েছে

বাপরে বাপ, কি হলো বাপ
কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াই —

ইত্যাদি। এখানে ভগ্নদূতের মতো লোককে লঘুচিত্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। তার ভাষায়ও অনেকটাই লৌকিক।

দোতরা

কোচবিহারে 'কুশান' পালাগানের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে 'দোতরা' পালাগানের কথা। রামায়ণকেন্দ্রিক পালাগান কুশান। লৌকিক কাহিনী, পুরনো কথা, ভগ্ন ইতিহাসের কোনো রোমান্টিক অধ্যায়ের অংশ বিশেষ নিয়ে গড়ে উঠেছে দোতরা পালার কাহিনী। হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর আকর্ষণে দর্শক-শ্রোতা আপ্লুত হয়ে থাকেন — এই দোতরা পালাগানে। দোতরা একটি বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রটির নামানুসারে দোতরা পালা লোকনাটকের পরিচয়। কুশান, বিষহরা, চোরচুন্নী, শাস্তরী, রাজধারী — কোনোটি বাদ্যযন্ত্রের নামানুসারে পরিচিত নয়। দোতরা পালা দোতরা বাদ্যযন্ত্রের নামানুসারে পরিচিত হওয়ার একটা কারণ হয়তো এই যে দোতরা যন্ত্র ছাড়া এই পালাগান কখনো হয় না। খোল, বাঁশী, জুরি, সারিন্দা, হারমোনিয়াম ইত্যাদির মধ্যে দোতরাকে অবশ্যই থাকতে হবে। লৌকিক কাহিনী, ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক উপাখ্যান এবং রূপকথাই হচ্ছে দোতরা পালার বিষয়বস্তু। দোতরা পালায় অভিনেতাদের গান ও সংলাপের মধ্যে কিছু সমাজ-অস্বীকৃত প্রেমকাহিনী থাকতো। নৃত্যের ও গীতের ভঙ্গি চটুল ছিল। তাই লোকালয় থেকে কিছু দূরে খোলা মাঠে এর আসর বসতো। এই পালানাটকের ব্যবস্থা করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা অনেক সময় অর্থ সংগ্রহের জন্য জুয়া খেলার আয়োজন করতেন। দোতরা পালার মধ্যে পরিচিত নাম — রূপধইন কইন্যা, করিম বাদশা, আলম সাধু, বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী, মরুচমতী, গুঞ্জুরা বিবি ইত্যাদি। ড. দিগ্বিজয় দে সরকার দোতরা পালা সম্পর্কে বলেছেন "দোত্‌রা ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক পালা।" তিনি অবশ্য এই পালায় সামাজিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও অলৌকিকতার স্থান দেখতে পেয়েছেন। কোনো কোনো পালা এক একটি ছোট্ট থীম নির্ভর। দুবলাবালী পালাটির মূল কথা 'কাঁচা-পাকা পিরিত' সম্বন্ধে সামাজিক মনোভাবের পরিচয়। বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী পালার বিষয় একটি রূপকথা ধর্মী কাহিনী — বিশ্বকেতু ও চন্দ্রাবলীর প্রেম। দোত্‌রা পালায় লোককাহিনী, কিংবা সওদাগর, সাধু, দেবতা-দানবের গল্প বেশ আকর্ষণীয়। রূপধন কন্যা, মরিচমতি, দুবলাবালী, বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী, মধুমালা-মদনকুমার, গুঞ্জরা বিবি, ধনপতি সওদাগর, রহিম বাদশা, করিম বাদশা প্রভৃতি খবুই জনচিত্তমোহনকারী লোকনাট্য। এসব পালার মূল কাহিনীতে থাকে একটি সরল চিত্তাকর্ষক মানবজীবনের গল্প। রূপকথার গল্প যে সহজ অথচ কল্প-জীবনের আকর্ষণ আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত রাখে এ পালাগুলিরও মধ্যে সেইরূপ আকর্ষণীয় কাহিনীর উপস্থাপনা করা হয়। এইসব কাহিনীতে থাকে একটি প্রেম ভালোবাসার কিংবা ন্যায় ধর্মের বা মানুষের জীবনের অন্য কোনো গল্প। যেমন বিশ্বকেতু চন্দ্রবলীর পালার গল্পে পাই রাজপুত্র বিশ্বকেতুর সঙ্গে দেবসভার নর্তকী চন্দ্রাবলীর প্রেম ও বিরহের কাহিনী। গুঞ্জরা বিবির পালা নেহাৎই রূপকথার গল্প। আবার চোখা ঠক' একালের সামাজিক পরিস্থিতিতে ঠক মানুষের পরিচয়।

দোতরা পালাগানের প্রাচীনতা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কোনো কথা বলা মুশকিল। অনুমান করা হয় এ গান বেশ প্রাচীন। কিন্তু এই প্রাচীনতার বিশেষ কোনো বাহ্যিক প্রমাণ নেই। অনুমান হয় মুসলমান শাসনামলে এ গানের প্রচলন শুরু হয়। দিগ্বিজয়বাবু এই নাটকে আদি লোকনাটকের রূপ লক্ষ করেছেন। এই গানের যে উপস্থাপন পদ্ধতি মঞ্চ সজ্জা, নৃত্যবাদ্য নীতের প্রয়োগ এসব বর্তমান নাট্য উপস্থাপনার থেকে আলাদা। প্রাচীন উপস্থাপন পদ্ধতি এবং লোক আঙ্গিক এ নাটকে দেখা যায়। এর প্রধান তিনটি দিক বাদ্য নৃত্য গীত এর মূল অবলম্বন। নৃত্য এর প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সহজভাবে যুক্ত। সংগীত এর মুখ্য আশ্রয়। তবে নৃত্যের যে রূপ বর্তমানে প্রচলিত তা খুব পুরানো নয়। নৃত্যে মেয়েদের অংশগ্রহণ আধুনিককালের সংযোজন। কিন্তু নৃত্যের যে চাল বা পদচারণা এবং হাত বা দেহের মুদ্রা তার মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট। নৃত্যের পদচারণার ভঙ্গিটি সরল কিন্তু সাঁওতালী নৃত্যের সরলতা তাতে নেই। তার চেয়ে কিঞ্চিৎ জটিল। কাজেই মনে হয় এতে নৃত্যরীতির যে প্রয়োগ তার দিক থেকে দেখলে এই নৃত্যগীতাত্মক নাটক কে প্রাচীন বলে ধারণা করতে হয়। কামতারাজ্যের পতন এবং কোচ-রাজ্যের উত্থান এই দুই যুগ-সন্ধিক্ষণের হোসেন শাহা কর্তৃক কামতা রাজ্যের আক্রমণের ফলে কোচবিহার অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। রাজা, আমির, ফকির, আর্গলিয়া পীর-পয়গম্বর ইত্যাদির গুণ-কীর্তন করে গ্রামীণ কবি শিল্পীরা পদ রচনা করতেন দোতরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে পালাগান পরিবেশন করতেন। এই পালাগান কালক্রমে মুক্ত আসরের মধ্যে পরিবেশিত হতে শুরু করে। এই গানের উৎপত্তিকালে একজন দোতরা বাজাতেন এবং গান করতেন, আর একজন সহযোগী শিল্পী গানের অর্থ ভেঙ্গে দিতেন এবং কাহিনীকে ধুয়ার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁরাই কালক্রমে মূল গীদাল এবং দোয়ারীরূপে পরিচিতি লাভ করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে রাজা-বাদশাদের বিগত জীবন-কাহিনী নিয়েও গায়করা গীত রচনা করে গান পরিবেশন করতেন। ফলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক সময় এই গানের চর্চা ছিল। পরবর্তীতে সম্পন্ন গৃহস্থরা এই গানের মধ্যে নৃত্য-গীতের চটুলতা লক্ষ করে একে দূরে ঠেলে দেন। কিন্তু এই পালাগানের জনপ্রিয়তা আরো বাড়তে থাকে। খোলা মাঠে স্বাধীনতাহেতু শিল্পী দর্শক উভয়েই এর বিষয় ও পরিবেশনের গুণে তৃপ্ত হতে থাকেন। পূর্বের মূল দু'জন শিল্পীর জায়গায় পরবর্তীতে চরিত্রানুযায়ী অনেক অভিনেতাদের অনুপ্রবেশ ঘটলো। কল্পনানির্ভর প্রেমনির্ভর, রাজ-কাহিনী নির্ভর কাহিনী বলে পাত্র-পাত্রীদের সাজ-সজ্জায় রাজকীয় পোশাক অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো।

বলা বাহুল্য আগে অভিনেতাগণের সবাই ছিলেন পুরুষ। মহিলা চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। এই অভিনয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে মূল গীদাল এবং দোয়ারী বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন। যে কোনো চরিত্রে যে কোনো দিকেই তাঁরা চলে যেতে পারতেন। মঞ্চপরিকল্পনায় আধুনিকতার নিদর্শন ছিলো না। আগে মাটির উপরেই আসর বসতো। বাদ্য-শিল্পী এবং অন্যান্য শিল্পীরা গোলাকার ভাবে বসতেন। তাঁদেরকে ঘিরে চারদিকে

অন্যান্য দর্শক-শ্রোতারা বসতেন। মঞ্চের চারদিকে চারটি বাঁশ বা কলাগাছের খুঁটিতে সামিয়ানা টাঙ্গানো হতো। সে সময়ে মশাল জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হতো। পরবর্তীকালে পড় বড় বড় গানের আসরে হ্যাজগ ও ডে-লাইটের ব্যবস্থা করা হলে নাটকের চাকচিক্য অনেক বেড়ে যায়।

দোতরা গানের আসর সাধারণত বড় উঠোন বা খোলা জায়গায় বসে। চারিদিক ঘিরে বসেন দর্শকেরা। দর্শকের দ্বারা ঘেরা মাঝখানের একটি প্রায়-বৃত্তাকার জায়গায় শিল্পীদের অবস্থান। শিল্পীদের মাঝে রেখেই নৃত্য করা হয়। আসরের মাথার উপর যে কোন আচ্ছাদন থাকে। আসরে বসে অভিনয়ের রেওয়াজ আগে ছিল না। কারণ আসরে নৃত্যরত ছোকরা, মূল, দোয়াড়ী ছাড়া তেমন কাউকে প্রয়োজন হত না। তেমন হলে বাজানদার কেউ উঠে সংলাপ ধরত। দর্শক অভিনেতা এখানে সমাসনে আসীন। সাজঘর (বাসাঘর) বলতে আসরের অদূরে ঘেরা-দেওয়া কোন স্থান। কিন্তু তার তেমন গুরুত্ব ছিল না। সাজ করবার পর চরিত্রগুলি সকলেই মঞ্চে উপস্থিত থাকত এবং প্রয়োজনের ভূমিকটুকু শেষ করে আসরেই বাদকারদের মধ্যে বসে পড়ত। এখন অভিনেতা সংযোজিত হওয়ায় আসরের গুরুত্ব বেড়েছে। আলোর ব্যবস্থা বলতে আগে ছিল কেরসিন তেলের বাতি। লোকে তখন পালানাটক দেখতে যাওয়ার চেয়ে গান শুনতেই যেত। ফলে স্বল্প আলোকে বা জ্যোৎস্নার আলোয় গান করবার অসুবিধে ছিল না। এখন শ্রব্যগুণের সঙ্গে দৃশ্যধর্মও যুক্ত হয়েছে। তাই আলোর ব্যবস্থার বদল হয়েছে। ডে-লাইট প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। তারপর এসেছে বিজলী আলো। এই উজ্জ্বল আলোতে দর্শকদের মঞ্চক্রিয়া দেখার সুবিধা হয়। মঞ্চমায়া সৃষ্টিতে নাটকে আলোর যে ভূমিকা এখানে তা নেই। লোকনাটক যতটা দেখার ততটাই শোনার ব্যাপার। বিশেষ কোন নাট্যক্রিয়া ছাড়া শোনার ব্যাপারটাই এখানে বেশী।

আসরের অভিনেতাগণ চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরেন। এখন চরিত্রের ভাব আনবার জন্য যতটা সম্ভব পোশাক ব্যবহার হচ্ছে। গ্রামীণ আর্থ-কাঠামো এবং পালাগানের দলের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে চরিত্রসকল পোশাক ব্যবহার করেন। তবে মূলের পরিচ্ছন্ন ধুতি-পাঞ্জাবীর ব্যবহার অপরিহার্য। দোয়ারীর বেশ কিছু মলিন হাঁটুর উপর ধুতি এবং গেঞ্জি বা সাধারণ জামা তার পোষাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ে রূপার গয়নার ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। এখন তার আর তেমন প্রচলন নেই। তার জায়গায় কাঁচের চুড়ি এবং ইমিটেশন সোনার গয়না এসেছে।

দোতরা পালাগান শুরু হওয়ার সময় অন্যান্য পালানাটকের মতো বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। এই বন্দনাগানের একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে —

— ও হো আইসো মা হে মা জননী, মোর দীনহীন কাঙ্গালের ডাকে।

আইসো মা সরস্বতী মোরে কর দয়া, চরণে স্মরণ নিলাম, দাও পদে ছায়া।

পালার রকমভেদে বন্দনার বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। এই বন্দনার সঙ্গে ছোকরারা নাচ শুরু করেন। গানের শেষ অংশ ধরে সমবেত বাজনদাররা সুর সহযোগে গান ধরেন। সেই সঙ্গীত ও নৃত্যের সহমিলনে পালাগানের উপস্থাপন হয়।

পালার বন্দনা অংশের গানে সরস্বতী, শিব-দুর্গা, নারায়ণ, ভানু-ভাস্কর, কালিকা ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন নদ-নদীর কথা, পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষলতার কথাও বন্দনা অংশে প্রকাশিত হয়।

বন্দনাশেষে শ্লোকধর্মী পদ্যাকারে সংলাপ শুরু হয়। সংলাপের মধ্য দিয়ে পালার কাহিনী এগিয়ে চলে। যখন পালা একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে যায় বা কোনো সিরিয়াস বিষয়ের দিকে এগোয় তখন দেখা যায় সংলাপ গীতিময় হয়ে ওঠে। দর্শক শ্রোতাও ঐ গীতের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেন। কোথায় গীতের ব্যবহার হবে তা সবসময়ই নির্দিষ্ট থাকে না। কেন না সংলাপ পদ্যধর্মী হওয়ায় তা সবসময়ই গীতের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। পালার গানের একটি বৈশিষ্ট্য হল তা সকলের গান। কেউ গান ধরলে পিছনে বসা বাদ্যকার মূল ও দোয়ারি সকলেই এই গানে গলা মেলান। এতে বোঝা যায় ব্যক্তিগত সাংগীতিক ধর্মের চেয়ে গোষ্ঠীগত গান এ পালার বিশেষত্ব।

গুঞ্জরা বিবির পালার একটি গান —

রন্দন রান্দে সুন্দরী কইন্যারে
রন্দন রান্দে সুন্দরী কইন্যা নাকে নড়ে বালী
রুই কাতেলার ভাজা আরো কই মাগুরের জালী
হাঁস দিয়া বাঁশ রান্দে কইতরের ছাও
শাল-শোল সাটি রান্দে বোয়ালের পাতাও রে।

গুঞ্জরা বিবির পালার এই গান মূল গীদালের মুখে গীত হয়। এখানে গুঞ্জরার রন্ধনের কথা। গানে গুঞ্জরার ভূমিকা নেই। অন্যপক্ষে 'আলাম সাধু' পালার বেগমের একটি গান এখানে দেখানো যেতে পারে — তা বেগমের নিজের গান।

ওহো প্রাণ সাধুরে সাধু
যদি সাধু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্ধি খান ওরে
দাড়ি মাঝি সাধু রাখেন সাবধনেরে
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যয়
পর নারী সাধু আপন নয়রে
পর নারী সাধু বধিবে জীবন রে

বন্দনার পর সংলাপ; সংলাপ চলতে চলতে আবার গান — এই সকল বৈশিষ্ট্য দোতরা পালাগানের একটি বিশেষত্ব। এই প্রসঙ্গে ড. সুখবিলাস বর্মার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য —

"After the Vandana comes the basic play, which in a sense is the dialogue section as the songs are in actually dialogues in a different form. What the characters sing, after having spoken in prose for a while, may either be a complement to the opinion introduced in the prose dialogue or an alternative means of presenting the same opinion."[৬]

("Bhawaiya : Ethnomusicological Study, p. 261)

পালা চলার মাঝে মাঝে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ফাস বা খোসা গানের ব্যবস্থা থাকে। সঙ্গীতের চটকা গানের তালে মূল গানের কথা কখনো ধরেই ছেড়ে দেন। অন্যান্য শিল্পীরা সেই গানের পদ ধরে গান শুরু করেন।

আরে চ্যাংরাগুলা মাইরছে দুরা
বাইগন নাই মোর গছতে
থাক্ দুরা তোক খামো ও হাটে।

ফাস গানের সঙ্গে মূল পালার সম্পর্ক নেই। এ ধরনের গান কতো পুরানো বলা যায় না। তবে লোক শিল্পীরা যে সব উপায়ে মনোরঞ্জনের চেষ্ট করেন এ তার অন্যতম। সম্ভবত লোকনাট্যের এই ধরনের প্রয়োগ দেখে যাত্রায় প্রসঙ্গ বহির্ভূত মনোরঞ্জনাত্মক কিছু 'ডুয়েট' সংযোজিত হয়েছিল।

দোতরা পালা গানে মূল গীদালের স্বাধীনতা কুশান গানের চাইতে অনেক বেশী। খোসা গান ছাড়াও কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উপদেশমূলক গান, আধ্যাত্মিক গান, মানবসম্প্রীতির গানও পরিবেশন করা হতো। এতে কাহিনীর ধারাবাহিকতায় তেমন ছেদ পড়ে না।

যেমন, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো।
পার করে আমারে

কিংবা, নানান বরণ গাভীরে ভাই
একবরণ দুধ
জগৎ ভমরিয়া দেখ সগায়
একইমায়েরপুত।

আসলে এই শ্রেণীর লোকনাট্যে কাহিনীর আঁট সাঁট উপস্থাপনা বা আঙ্গিকের বৈচিত্র্য কেউ খোঁজে না।

কিছুটা অবসর বিনোদন ও আনন্দ লাভই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সঙ্গে অধ্যাত্ম উপদেশ বাড়তি পাওনা রূপে আসে। সময় যেখানে যথেষ্ট এবং লোক মানস রস আস্বাদনে বিশেষ বৈচিত্র্য চায় না সেখানে নাট্য প্রয়োগে বা নাট্য কাহিনীতে তেমন মনোযোগ দেওয়ার দরকার হয় না। লোক কল্পনা যথেষ্ট পরিভ্রমণশীল হয়ে নানা বিষয়ের ভিতর থেকে আনন্দ সম্ভোগ করে। এই জন্য একই পালার মধ্যে নানা রসের প্রয়োগ কোনো রসাভাস সৃষ্টি করে না।

'আলম সাধু' পালায় দেখা যায় আসর বন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে। আলম সাধুর বাণিজ্যে গমনের কথা গান ও সংলাপের মধ্য দিয়ে শুরু। অনুরূপভাবে অন্যান্য চরিত্র সকল যথাক্রমে বেগম, রহিম, আয়েষা, ধাইমা, জাগীরাম বাদশা, গাটুনাপিত সকলেই গান ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ বক্তব্য আসরে নিবেদন করছেন।

সুখবিলাস বর্মা এ প্রসঙ্গে বলেন "... গান আসলে সংলাপেরই সম্প্রসারণ, সংলাপের ভাষার সঙ্গে গানের ভাষার পার্থক্য ব্যাকরণগত নয়, ধ্বননগত (Prosodic). গানের উচ্চারণে আছে সুরের সহযোগে স্বরের অতিমাত্রিক দীর্ঘীকরণ। গানের ভিতর এই ধ্বননগত পার্থক্য নাটকের শৈল্পিক তথা প্রয়োগগত প্রয়োজনেই রক্ষা করা হয়। কোনও বক্তব্যের নাটকীয় গুরুত্বকে জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই সংলাপের মধ্যে চড়া সুরের সংযোজন ঘটিয়ে সংলাপকে গানের সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়।"[৭]

পুরো পালা নাটক ঘিরেই নৃত্যানুষ্ঠান একটি অপরিহার্য অঙ্গ। খোসা গান, ধুয়া এবং পয়ার পরিবেশনকালে নর্তকীদের নৃত্য-প্রদর্শন চলতেই থাকে। সেই সঙ্গে দোয়ারীর হাস্যকৌতুক এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দর্শককে আকৃষ্ট করে। লোক আঙ্গিকের ধরানায় চটুল নৃত্যের প্রভাব বেশী। বর্তমানে পালা নাটকের মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটনার ফলে নৃত্যের কিছুটা ঢং-ও পাল্টে গেছে। যাত্রা পালা ইত্যাদির প্রভাবে দোতরাপালার চিরাচরিত নৃত্যের মুদ্রা, ছন্দ, মাত্রা ও তাল কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। মূল গীদালের হাতের দোতরার সঙ্গে খোল, করতাল, সারিন্দা ও বাঁশী অনবদ্য যন্ত্র-ধ্বনির মধ্যে অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠানে নৃত্য লীলায়িত হয়ে ওঠে। 'বন্দনা' পাঠ থেকে শুরু হয়ে ধীরে কখনো ক্ষিপ্র গতিতে আবার কখনো কাহিনীর উপযোগী বেদনাময় দৃশ্যের সঙ্গে নৃত্য-নাটকের পরিণতি পর্যন্ত চলতে থাকে। ধারাবাহিত সংলগ্নতার মধ্য দিয়ে দোতরা পালা কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে চলে আসে। এই নৃত্যের পদচারিতা ও দেহ ও হাতের মুদ্রাও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পদচারিতার চাল সোজা না হয়ে কিছুটা আঁকাবাঁকা ভাবে চলে।

পরে সহযোগী শিল্পী দোয়ারীর উপস্থিতি ঘটে। মূল গায়ক, দোয়ারী এবং পরে নর্তকীদের সহযোগে নাটকীয় রূপটির প্রকাশ ঘটে। অনেক পরে গদ্য সংলাপের ব্যবহার শুরু হয়।

'আলমসাধু' দোতরাপালার পর্যালোচনা :

আসরে ওঠার আগে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভক্তি-প্রণাম করেন। দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করার জন্য এবং তাদেরকে পালার শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য কখনো কখনো মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হচ্ছে।

'মুই ফল্লা (মূল গীদাল) আসরত বসিলুং
ঈশ্বর মহাদেবের পুত।
আখসুরথ বলিস্যং ফান্দ
ওক্তো উপরে পোও
মোক দেখিয়া সভার লোক
নজর কিল্লে খাড়া।
আল্লা নাগে তাল্লা।
উচুল নাগে ধান্দা
এই মন্তর দিয়া সভার লোকের
আঁখ কইলং বন্দি
এই বন্দি যদি ছোটে
আল্লা উচুলের সিংহাসন কাঁপে

সাজঘর থেকে বেরোবার আগে মন্ত্রের কাজটি শেষ হয়।

মূল গীদাল, দোয়ারী, নর্তকীর দল এবং বাজনাদাররা মিলে সবাই একসঙ্গে আসর বন্দনায় অংশগ্রহণ করেন। মূল গীদাল মূল পদ শুরু করেন। অন্যান্যরা ধুয়া ধরে গান করতে থাকেন। 'আলম সাধু' পালার বন্দনার কিছু অংশ-

আইসেক মাও মোর সরস্বতী মা
ওহে মা মোর সভার ভিতর হে
আইসেক মাও মোর সরস্বতী মা।
আইসেক মাতা সরেস্বতী রথে করিয়া ভর।
জৈ জোগারে নামেক মা তুই মোর সভার ভিতরে
মোর সবা ছাড়িয়া যদি মা অন্যের সভা যাও
আর কোনো কিড়া না দেও হে
ওহে মা ধর্মের মাথা খাও হে

প্রথমে বন্দনা করি শিবের চরণ।
শিবেরও ঘরণী বন্দং মাও ভগবতী।
তাহার দুটি কন্যা বন্দংহে ওহে মা
আইসেক লক্ষ্মী সরস্বতী হে।

'করিম বাদশা' দোতরা পালার বন্দনা শুরু হয় এইভাবে

বন্দনা –

ছাওয়াল গাজিল
তোমার পদে বন্দিকি ছালাম
আট গুরু বন্দং
পাট গুরু বন্দং
শিক্ষা গুরুর পাও
যে গুরু হস্ত ধরিয়া
শিখাইছে ডাইন বাও
ছাওয়াল গাজিল
তোমার পদে বন্দকি ছালাম।

বিভিন্ন গুরুদের বন্দনা প্রথম হয়। তারপরে মা সরস্বতীর বন্দনা। মা সরস্বতীর বন্দনা প্রত্যেকটি দোতরা পালায় আছে। বন্দনার শেষে একটি চটুল সঙ্গীতে খোসা গান হবে। এই গান কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয়। আসরকে জমজমাট করতে খোসা গানের সঙ্গে নাচও হয়।

"পার করোরে চ্যাংড়া নাইয়া
সময় বৈয়া যায়
পারের বদলে ওরে নাইয়া
যৈবন করিবো দান
পার করোরে চ্যাংড়া নাইয়া
সময় চৈলা যায়।"

খোসা গান শেষ হয়। মূল গায়ক আসরে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেন। মূল গায়ক শুরু করেন

'হায়রে — বন্দনা গানেরও কথা রইল ভালে ভালে
সোতরা পালা গানের কথা শুনি সকলে
ধর্মপুরে ছিল সাধু ধর্ম অধিকারী
সোনারূপার বানাইচে সাধু আট মহলা বাড়ি।
ধনে আসন ধনে বাসন ধনের নাইরে সীমা।
ধন দিয়া বান্ধিতে পারে আগম করিয়া।
তার পুত্র আলম সাধু নামেতে সংসারে
১৪ বছর যাবে সাধু বানিজ করিবারে।
যখন যাবে দেখ বানিজ করিবারে
তিনটি গোপন কথা বলিবে ছাইলার আগে।
একটি মাত্র পুত্র বিধি দিছে তাহার কোলে।
সেই পুত্র ডাকি কথা লাইগাছে বলিবারে।

ধর্মপুরের সাধু ধর্ম অধিকারীর পুত্র আলম সাধু। চোদ্দ বছরের জন্য বানিজ্যে যাবার আগে আলম সাধু পুত্র রহিমকে ডেকে তিনটি গোপন কথা বলেন। সেই কথা তিনটি রহিমকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

আলম সাধুর প্রথম কথা — 'এই যে গর্ভবতী ঘুড়ীটাক ছাড়িলোং ঘোড়াশালাটার মাঝে।
ঐ ঘুড়ীর উদরে যদি ঘোড়া পয়দেশ করে —
লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা করিবু বসি দ্বারে।
আর ঐ ঘুড়ীর উদরে যদি ঘুড়ী পয়দেশ করে,
সে ঘুড়ীক কাটিবু, না রাখিবু ঘরে।'

দ্বিতীয় কথা — 'গর্ভবতী হস্তিনীক ছাড়িলাং হস্তিশালের মাঝে।
ঐ হস্তিনীর উদরে যদি হস্তী পয়দেশ করে —
লক্ষ টাকা দান করিবু বসি দ্বারে
আর হস্তিনীর উদরে যদি হস্তিনী পয়দেশ করে।
সে হস্তিনীক কাটিবু না রাখিবু ঘরে।

তৃতীয় কথা — 'গর্ভবতী তোর মাক ছাড়িলাং নাট মন্দির ঘরে।
তোর মার উদরে যদি ভাই পয়দেশ করে।

লক্ষ টাকা দান দক্ষিণা করিবু বসি দ্বারে।
তোর মার উদরে যদি বৈনি পয়দেশ করে —
সে বৈনিক কাটিবু না রাখিবু ঘরে।"

এই তিনটি নির্দেশ রহিমকে পালন করতে হবে। তৃতীয় কথায় রহিম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। আলম সাধু বিদায় নেন বেগমের কাছে। রহিমকে গুরুর পাঠশালায় রাখার নির্দেশ দেন। বিদায়ের সময় বেগম গান গেয়ে ওঠেন—

"ওহো প্রাণ সাধুরে সাধু
যদি সাধু বানিজ যান
নিজের হস্তে সাধু রান্দি খান ওরে।
দাড়ি মাঝি সাধু রাখেন সাবধানেরে।
কোচাত করি সাধু না করেন ব্যায়
পরনারী সাধু আপন নয়রে
পরনারী সাধু বধিবে জীবনরে।"

এখানে ফুটে উঠেছে বেগমের আর্তি। পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে নিষেধ করেছেন, মিতব্যায়ী হয়ে চলতে বলছেন — এরকম নির্দেশ রয়েছে গানটিতে। স্বামী বিচ্ছিন্না নারীর মনের বেদনায় ভরা এই গান। বলা যেতে পারে এই জাতীয় গানগুলিই আলাদা করে ভাওয়াইয়া গানরূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। তাই অনেক বলে থাকেন দোতরা পালাগানই ভাওয়াইয়া গানের উৎস। আলম সাধু চোদ্দ বছরের ডিঙ্গা সাজিয়ে নেন। এই ডিঙ্গা সাজানোর নানা কথা গীদাল ভাবে বর্ণনা দেন। চৌদ্দ বছরের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী ডিঙ্গাতে মজুত করা হয়। ধীরে ধীরে মধুকর ডিঙ্গা বিদেশের দিকে এগিয়ে চলে।

ধনপতি সদাগর, করিম বাদশা, সাত সতীনের পালা — এই সকল দোতরা পালাতেও বাদশা ও সদাগরদের বানিজ্যে যাওয়ার দৃশ্য আছে। একই অঞ্চলে এই পালাগুলো অভিনীত হওয়ার জন্য কাহিনীর ভেতরের সাদৃশ্য থাকাটা স্বাভাবিক। অন্যদিকে বেগমের উদরের সন্তান ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। গর্ভে বড়ো হয়ে ওঠার বর্ণনা পদোর সুরে মূল গায়ক এবং দোয়ারী তুলেধরেন।

মূল গায়ক বলছে — এক মাসও হইলে গর্ভ জানি কি না জানি।
দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে — দুই মাসত হইলে গর্ভ লোকের কানাকানি।

এইভাবে বর্ণনা চলতে থাকে। বেগমের প্রসব বেদনা উঠলে 'বাইমা' কে আনা হয়। ধাইমার কথা — "বাপরে বাপ মুই যখন আসি পুচ্চুং আর ভয় কিসের"।

ধাইমার সংলাপে আছে গ্রামের ঘরের ভাষা।

সংকট সময়ে ধাইমার চতুর বুদ্ধি কাজ করে। বেগমের সুন্দর শাড়ীর প্রতি তার লোভ। সেই শাড়ী পড়ে ধাইমা শুশ্রুষা করেন —

"সেই শাড়ী পিন্দিয়া ধাইমা বেগমক ধরিল।
আন্দার ঘর আলো করি ছাওয়া জন্ম নিল।
বিধির বিড়ম্বনা দেখ কি হইতে কি হইলো
কইন্যা ছাওয়া দেখি বেগম কান্দিতে লাগিল।"

কন্যা সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ আছে রহিমের উপর। বেগম বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বিধির বিড়ম্বনা বিধির লিখন এই কথা গোটা নাটকেই আমরা মাঝে মাঝে পাই। বেগম বলেন —

ধাইমা, বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।
অকালে অভাগীর মরণ
মোর পুত্র রহিম আছে গুরুর পাঠশালে,
শুনা মাত্র ধায়া আসিয়া কইন্যারে কাটিবে।

পদ্যসংলাপের সঙ্গেই গদ্য মিশিয়ে বলেন — রহিম যে পিতৃসত্য আবদ্ধ ধাইমা। পিতৃ আদেশ রহিম পালন করবেই।

উত্তরে ধাইমার একেবারে নিজস্ব সংলাপে —

"এই বুদ্ধিটায় নাই পান। শুন মোর কথা, মুই কালি যাইম রহিমের পাঠশালা। যায়া কইম, রহিম, তোর মার ওদরে একটা ভাই জন্ম নিচে। আর ঐ ভাবা পণ্ডিত রহিমক গণনা করি কয়া দিবে, রহিম আজ থাকি ১২ বছর পর্যন্ত তুই তোর ভাই এর দেখা করিব পাচু না। দেখা করিলে তোর ঝালা নাগি তোর ভাই মরিবে, না হয় তোর ভাই এর ঝালা নাগি তুই মরিবু। এই জন্যে পাঠশালা ছাড়িয়া তুই ঘোর বনে যা।"

ধাইমার এই বুদ্ধিতে রহিম ঘোর বনে চলে যান। রহিমের বোন আয়যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেন। কিন্তু বেগম বিষণ্ণ হয়ে থাকেন আয়যা মার কাছে জানতে চান তাঁর দুঃখের কারণ।

"উপায় অন্ত না পাইয়া জননী বেগম
কহিল খুলিয়া সত্য বিবরণ।
শুন শুন শুন বাছা জবাব শুনেক মোরে।
পিতৃসত্য পালিবে রহিম কাটিয়া তোমারে।

মার কাছে দাদার কথা শুনে আয়ষা আপ্লুত হন।

"মা, না দেও যদি দাদার মনে হইতে দরশন

জানিয়া রাখ মাতা আমার মরণ।"

রহিমের বনবাস, আয়ষার অদম্য ইচ্ছা — একটা ভীতিপূর্ণ সংকটের মধ্যে বেগম। বেগম আয়ষাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন — "দেখ মা, তোক দেখা মাএ রহিম কাটি ফেলাইবে। যদি বাচির চাইস — "দাদা দাদা বলিয়া একবার কমড় জড়েয়া ধরিলে আর মারির পারে না। না হইলে তোর মরণ।"

আয়ষা ঘোর জঙ্গলে দাদা দাদা বলে চীৎকার করেন এবং বলেন "শুনেক দয়ার দাদা জবাব শুনেক মোরে মিথ্যা খবর দিছে ধাই নিকটে তোমারে। মুই তোর দয়ার বৈনি আয়ষা মোর নামটি, আলম সাধু পিতা, দাদা, জননী বেগম।" এই কথা বলেই আয়ষা দাদার কোমর জড়িয়ে ধরেন। রহিম কপালে আঘাত করে বলেন—

ভালক না কং ভাল্ মোর বিধাতা মন্দক না কং ভাল্।

মন্দ নয় কালি আর কলম, মন্দ মোর কপাল।

কাহিনীতে রয়েছে নিয়তির পরিহাস। এরকম ঘোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় রহিম। একদিকে পিতার নির্দেশ পালনের কর্তব্য, অন্যদিকে ভাই ও বোনের মধুর মিলন কোনটি ঠিক রহিম বুঝে উঠতে পারেন না। তাই সবকিছু ভাগ্যের পরহিাস বলে মনে করেন। ভাই বোন জঙ্গলে বাস করেন। বীর পালোয়ান রহিম বনে শিকারে যান। ক্রমে ক্রমে আয়ষা যুবতী হয়ে ওঠেন। দাদা ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের মুখ দেখতে পান না। নিজ-রাজ্য থেকে অনেক দূরে জাগিরাম বাদশার জঙ্গলে তাদের ঠিকানা। একদিন জাগিরাম বাদশার নাপিত গাটু আয়ষাকে দেখতে পান। এই দৃশ্যের পরেই দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য গাওয়া হয় একটি খোসা গান। দোয়ার ও নর্তকীরা নাচ ও গান করতে থাকে।

"ওরে চ্যাংরাগুলা
মাগুর মাছের ঝোল দিয়া
তুই ভাত খায়া যা।
ঝরি পড়ে ঝপঝপে
চ্যাংড়াগুলা মাছ কুড়ায় টপটপে।
কৈ দিয়া হ্যার কবিলাক
নাউ দিয়া আন্দি থুছোং
মাগুর মাছের টক।
চ্যাংরাগুলা মাগুর মাচের ঝোল দিয়া তুই ভাত খায়া যা।"

নাপিতের সঙ্গে আয়ষার একান্তে পরিচয় হয়। গাটু নাপিত জাগিরাম বাদশার কাছে আয়ষার সৌন্দর্যের বর্ণনা দেন। বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে জাগিরাম গাটুকে আয়ষার কাছে পাঠিয়ে দেন।

গাটু আয়ষকে বলেন — "কইন্যা, তোমার দুঃখের হইবে অবসান। জঙ্গলে থাকির আর লাগিবে না। জাগিরাম বাদশা নিজে মোক ঘটক করিয়া পাইছে। এ্যালাখানি তোমার মতামত বাকি। বাদশা যে তোমাক কোটে রাখিবে — কন কন তাড়াতাড়ি, কয়া ফেলান।"

কোথাও কোথাও মঞ্চে দোয়ারীই গাটুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই রীতিটিই পুরানো। বর্তমানে গাটু চরিত্রের অভিনয় করার জন্য অন্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট থাকে। মূল গীদালের গায়কীর উপর নাটকের গতি ও আকর্ষণ নির্ভর করে। আয়ষা গাটু নাপিতের প্রস্তাব উড়িয়ে দেন না। দাদা রহিম বীর পালোয়ান। তাঁর সঙ্গে জাগিরাম বাদশা লড়াই করে জিততে পারবেন না। গাটু নাপিতের এই সংবাদে জাগিরাম বাদশা সৈন্য সামন্ত নিয়ে জঙ্গল ঘিরে ফেলেন। রহিমকে নিহত্য করে আয়ষাকে নিয়ে যেতে চান।

দীর্ঘ ঘটনাকে মূল গীদাল গানের সুরে টেনে নিয়ে চলেন —

"সৈন্যের কোলাহল উঠিল গগনে
করিয়াছে আক্রমণ বুঝে এতক্ষণে।
উঠিয়া দাড়াইল রহিম নয়নে দেখিল।
শত শত সৈন্য তারে ঘিরিয়া ফেলিল।
তাই দেখিয়া রহিম কোন বা কাজ ও করে।
জিন্নাপীরের স্মরণ করি ঘোড় পৃষ্ঠে চড়ে।"

লক্ষ করবার বিষয় রহিম জিন্নাপীরের স্মরণ করেন। আলম সাধুও জিন্নাপীরের শিষ্য। জিন্না পীরের দয়ায় রহিম শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। যুদ্ধে জাগিরাম বাদশা পালিয়ে যান। জাগিরাম বাদশার সঙ্গে আয়ষার পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। দাদার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আয়ষা গাটু নাপিতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পরপুরুষের জন্য যুবতী আয়ষার ইচ্ছা —

"শুন নাপিত ভাই পাখির বসন্তকালে ডালে বান্ধে বাসা
ফুলেরও বসন্ত কালেরে ঐনা করে ভোমরার আশা।"

ভোমরার জন্য আয়ষার ব্যাকুলতাকে রহিম বুঝে উঠতে পারে না। যুদ্ধ-বিজয়ী ক্লান্ত রহিম সাগরের জলে স্নান করে আয়ষার কাছে ফেরেন। রহিম যুদ্ধে নিহত হন নি। জিন্না পীরের বরে রহিম অমর। তাঁর মৃত্যু উপায় জানার জন্য আয়ষার এখন প্রবল প্রচেষ্টা। ঘটনার মধ্যে রয়েছে চমক। এই পর্বে এসে লোকনাটক তার ঢিলেমি ভাব ছেড়ে আরো গতিশীল হয়।

আয়ষা কৌশলে দাদার কাছে তার মৃত্যুর কথা জেনে নেয়। বোনকে বিশ্বাস করে রহিম বলে —

বৈনি মরণের বিধান আজি খুলিয়া বলং তোকে।
দোহাই লাগে কাক পক্ষী কাও যেন না জানে।
শুন বৈনি, বিশ্বকর্মা দিয়া এক লোহার পিঞ্জিরা।
সপ্তকোটা সপ্ততালা নির্মাণ করিয়া,
তার মাঝে ছেদ সুয়া রাখিল বানেয়া।

এরপর গদ্য সংলাপ — নিশ্চয় জানিবে দাদার মরণ পিঞ্জিরা সেই পিঞ্জিরার ভেতর গেইলে আর ফিরিয়া আসিবার না পাইবে।

মরণ-ফাঁদের কথা আয়ষা যথারীতি গাটু নাপিতকে জানিয়ে দেন। সাগরের পাড়ে জাগিরাম বাদশা সপ্তকোটা সপ্ততালা দিয়ে পিঞ্জর বানিয়ে তার ভেতরে একটি সুয়া পাখীকে রেখে দেন। একটার পর একটা কৌশল করে আয়ষা তাঁর উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। নাটকের অভিনেত্রীর চোখে মুখে সেই ভাব ফুটে ওঠে। দাদার সঙ্গে সাবলীলভাবে কথা বলেন আয়ষা। একজন সুন্দর নর্তকীর অভিনয়ে তা প্রকাশ পায়। মূল গায়কের প্রশ্ন এবং পদের ব্যাখ্যা করেন দোয়ারী। আয়ষা রহিমকে ভুলিয়ে গোদাদেও সাগরে নিয়ে যান। এই যাত্রাপথে রহিমের মন বাঁধা পায়। মাথার উপর টিকটিকির শব্দ। গাছের শুকনো ডালে কাকের কা-কা শব্দ। এই সব অশুভ সংকেত রহিমকে বিচলিত করে। রহিম বলেই ফেলেন

— "দেখ বৈনি ঘর হাতে বেরেয়া মুই বায়রত দিনু পাও। মাথার উপরা জিটি করে টেঁও টেঁও। আজি দেওসাগরে যাওয়া বাদ দে বৈনি। দেখ বৈনি, গছের শুকান ঠালত পড়িয়া কাগা কা-কা করির ধইচেক। ... না বৈনি এত বাঁধা ফেলে যাওয়া যায় না।"

এই লোকনাটকে পাওয়া যায় লোক-বিশ্বাসের কথা। এই লোক বিশ্বাস চরিত্রের মনের অবস্থাকে চঞ্চল করে। আয়ষার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা নিপুণভাবে তৈরী। গোদাদেও সাগরের পাড়ে 'সপ্তকোটা সপ্ততালা পিঞ্জিরার' ভেতর 'সুয়া' পাখী দেখে রহিম ভেতরে ঢোকেন 'সুয়া' পাখীকে ধরতে। এখানে আয়ষা একটি দুঃখের গান গেয়ে ওঠেন। সে ঘরে একলা থাকেন। সুয়া পাখী পেলে খুশী হবেন।

"ওমোর দাদারে, ঘরে থাকং দাদা মুই একলা নারী`
পিঞ্জিরার সুয়া পাখী মোকে দেও ধরি।
সারাদিন খেলা করিম সুয়া পাখি সনে।

জননীর কথা দাদা না পড়িবে মনে।

বিগলিত রহিম সুয়া পাখী ধরতে গেলে পিঞ্জরে আটকা পড়ে। মৃত্যু অনিবার্য জেনে আয়ষার যৌবন প্রগলভ মূর্তি ভেসে ওঠে আমাদের সামনে —

"মনে বড় দুঃখরে মরা চিতে বড় দুঃখ।
তোর জন্যে দেখিবার না পাঁও পর পুরুষের মুখ।
হারাচুং বাড়ী, হারানু মাও জননী
তোর বাদে না ঝুরে মোর এক চোকেরও পানি।"

পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি আয়ষা। পিপাসায় কাতর রহিম তাঁর কাছে জল চাইলে আয়ষা বলেন — 'পানি খাবার চাইস, মনে বড় সাধ।
মল মূত্র দিব তুলি বারাইস যদি হাত।

আয়ষার নির্মম কথা। ধনপতি সদাগর, রূপধন কইন্যা, মরুচমতি, দুবলাবালি কোনো দোতরা পালায় এরকম চরিত্রের দেখা মেলে না। যৌবনের দুর্বার গতিই তাকে এরকম করে তুলেছে। নারীর এই দিকটির দিকেই লক্ষ্য করে কি আলম সাধুর তিনটি সত্যের পালন করার নির্দেশ ? এই নাটকের বিষয়বস্তুতে দেখা যায় সে রকম ভাবনাই। স্ত্রী ঘোড়া, স্ত্রী হাতী এবং কন্যাকে কেটে ফেলতে হবে — রহিমের প্রতি আলম সাধুর এরকম নির্দেশ নাটকের শুরুতেই পাই। নাটকের দৃশ্যের বদল হয় একটি খোসা গান দিয়ে। নাটকের গতি ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গ তি রেখে গান —

ওরে প্রাণ পাখীটা যে দিন তোরে যাইবে ছাড়িয়া
অবোধ মনরে, সোনার খাচার দরজা ভাঙ্গিয়া।
মন তোর মিছা বাড়ীঘর রে অবোধ মন।
প্রেমের বাজারে একদিন ভাঙ্গিবে নারায়ণ।
মিছা বাড়ীঘর রে মন রবে তো পড়িয়া।
আসিবে যমের দূত লইয়া যাইবে বান্ধিয়া।"

এই গানের পরে মূল গায়ক পদ্যের সুরে বলেন —

"যেইনা কালে রহিমের প্রাণ পাখী উড়ি গেল।
আগমে থাকিয়া জিন্নাপীর জানিতে পারিল।

গোদা দেও সাগরে আসি উপনীত হইল।
মাছি হইয়া জিন্নাপীর রহিমের দেহেরে
প্রবেশ করিল পীর রক্ষা করিবারে।

পীরের শিষ্য আলম সাধুও স্বপ্নে পুত্রের মৃত্যুর কথা জানতে পায়। চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে আলম সাধু গোদাদেও সাগরে উপস্থিত হয়। আলম সাধুর কাতর প্রার্থনায় জিন্নাপীর বলেন

ওহে সাধু জিন্নাপীরের নাম নিয়া আরো সাগরের পানী।
সেই পানী ছিটাইয়া দেও বিসমিল্লা জানি।

জিন্নাপীর ফকিরের বেশে সেই জল পিঞ্জরে ছিটিয়ে দিলে রহিম বেঁচে ওঠেন। ফকিরের নির্দেশে রহিম জাগিরাম বাদশার মহলে আয়যার উদ্দেশ্যে চলেন।

নাট মহলের কপাট ভাঙ্গে পদাঘাত করিয়া।
কোথায় আছে দুষ্টা আয়যা পালংকেতে শুইয়া।
নিমেষেতে কাটিয়া মুণ্ড নামিল হস্তে নিয়া।
ঘোড়া পৃষ্ঠে উড়িয়া রহিম উড়াইল বাতাসে।
পিতা পিতা বলিয়া রহিম কোন বা কাজও করিল।
পিতার চরণে বৈরির কাটা মুণ্ড দিল।
আজি হইতে পিতৃসত্য হইল পালন।
আলম সাধু বলে পুত্র কান্দ কি কারণ।
রহিম বলে ওগো পিতা জননীর তরে
দেখিয়া এই কাটা মুণ্ড কি বলিবে মোরে।"

পিতার নির্দেশ পালনে জিন্না পীরের ভূমিকা আছে। মায়ের জন্য ফুটে উঠেছে রহিমের দরদ। জিন্নাপীরের অলৌকিক শক্তির প্রতি আলম সাধু ও রহিম ভক্তি নিবেদন করেন। আলম সাধুর মুখ দিয়ে জিন্না পীরের কীর্তির কথা প্রচারিত হয়—

ওরে জিন্না পীর, জিন্নাপীর, করিয়া যদি করো মনস্থির।
ওরে আগমে থাকিয়া মনস্কাম পুরায় পীর।

মূল গায়ক শেষে বলে ওঠেন —

ভাইরে, এই পর্যন্ত করিলাম ক্ষান্ত

পালাগানের কথা

নাই কোন ভয় হবেরে জয় ধর্ম যথাতথা।

সত্যের জয় হবে — এই নীতি কথা দিয়ে আলম সাধু পালানাটকটি শেষ হয়।

'আলম সাধু' পালা নাটকে পীরের অলৌকিক শক্তি দেখানো হল। আর দেখানো হল সমাজে নারীর বিশ্বাসঘাতকতার ছবি। নারীর প্রতি মধ্যযুগের সমাজের মানসিকতার পরিচয়ও এতে আছে। একদিকে পীরের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন ও অন্যদিকে অবিশ্বাসিনী নারীর শাস্তির কাহিনী পালানাটকে তুলে ধরে এ পালানাটকে মধ্যযুগের লোকসমাজের মানসিক অবস্থানের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

রাবাণ

'রাবাণ' একটি পালানাটক। 'কুশান' পালাগান যেভাবে পরিবেশিত হয় 'রাবাণ' সেভাবেই পরিবেশিত হয়। রামায়ণের যে কোনো কাহিনী আবলম্বনে 'কুশান' পালা অভিনীত হয়ে থাকে। রাবাণের বিশষত্ব এই যে কেবলমাত্র রাবণের কাহিনী নিয়ে এই পালা অভিনীত হয়। 'রাবণ' শব্দ থেকে 'রাবাণ' শব্দের উৎপত্তি। অনেকে 'রাবাণ'-ক 'আবান' রূপেও উচ্চারণ করে থাকেন।

'কুশান' গানের মূলের হাতে যেমন 'ব্যানা' থাকে 'রাবাণ' গানের মূলের হাতেও সেরকম একটি ব্যানা যন্ত্র থাকে। মূল গীদাল এখানে রাবণ'কে প্রধান চরিত্র হিসেবে পালায় উপস্থিত করেন। রাবণের বীরত্ব, শক্তি, দাম্ভিকতা এবং ভক্তি মূল গীদাল এবং পালাচরিত্রগুলির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সাধারণত ১২ থেকে ১৪ জন পালি বা সদস্য এই পালাগানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সারিন্দা, খোল, জুড়ি, হারমোনিয়াম, আড় বাঁশী এই পালাগানে ব্যবহৃত হয়।

মঞ্চ পরিকল্পনা 'কুশান' পালাগানকে অনুকরণ করে হয়। 'রাবাণ' গানের প্রচলন কুশান গানের অনেক পরে এসেছে বলে অনুমান। কুশানের প্রায় সব আঙ্গিকই 'রাবাণ' পালাগানে লক্ষ করা যায়। রাবণের মহিমাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই পালাগান। ফলে সঙ্গীতে কুশানের সুর অবলম্বন করলেও এই পালাগানের সঙ্গীতে বীর ও করুণরসের আধিক্য দেখা যায়। পালা শুরুর পূর্বে মূল গীদাল 'বন্দনা' করেন। কুশানে যেমন রামবন্দনা দিয়ে শুরু হয়, এই পালাগানও রামবন্দনা দিয়ে শুরু হয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে কুশানের অনুকরণে রাবাণের বন্দনা শুরু হয়।

বন্দনার শেষে মূল ঘোষণা করেন 'রাবাণ' পালাগান শুরু করার কথা। তাঁর কথাকে বোঝার জন্য দোয়ারী ব্যাখ্যা দেন। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলা হয় 'ভাঙ্গতি' দেওয়া। দোয়ারীর ভাঙ্গতি দেওয়াকে অনুসরণ করে দর্শক ও শ্রোতা পালাগানের ভিতরে প্রবেশ করেন।

আবার দোয়ারীর প্রশ্নকে মূল ভাঙ্গতি দেন। মূল গানের 'ধুয়া' তোলেন। ধুয়ার অংশ ধরে দোয়ারী এবং ছোকরা বা ছুকরিরা গানের সঙ্গে নাচতে থাকেন। পূর্বে এই ছোকরাদের ভূমিকায় অল্পবয়সের ছেলেরাই থাকতো। এখন মেয়েরাই সেই ভূমিকা পালনকরছেন। নর্তকীর মধ্যে 'ডাইনা' ছুকরী মূল এবং দোয়ারীর নির্দেশ এবং ইচ্ছাকে অনুসরণ করেচলেনা বলতে গেলে নৃত্য প্রদর্শনের বিষয়টি দোয়ারকে অনুসরণ করে চলে। দোয়ার বিহীন এই 'রাবাণ' পালাগান পরিবেশিত হওয়া অসম্ভব। মূলের কথার অর্থ দর্শক শ্রোতাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেওয়া, নর্তকীদের সম্পূর্ণ নির্দেশ জ্ঞাপন করা এবং নাটকের গতিকে ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দোয়ার বহন করেন। এই দোয়ারই আবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। দীর্ঘক্ষণ

পালা চলতে থাকলে মাঝে মধ্যে এক ঘেয়েমী কাটানোর জন্য খোসাগান বা ফ্যাসাগান দিয়ে রুচি পরিবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া হয়ে থাকে। এই খোসা গান বা ফ্যাসা গান কুশান ও দোতরা পালাতেও ব্যবহৃত হয়। খোসাগান বলতে চটুল প্রকৃতির ভাওয়াইয়ার সুরে গাওয়া সঙ্গীতকে বোঝায়। খোসা গান পুরোপুরি দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য কাহিনী বহির্ভূত গান। ফ্যাসাগান মূলত: হাসি-ঠাট্টার গান। একই উদ্দেশ্যে পালাগানে এই গান ব্যবহৃত হয়।

কোচবিহার জেলার 'রাবাণ' গান 'কুশান' পালার আঙ্গিকেই পরিবেশিত হয়। এই অঞ্চল ব্যতীত জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ এলাকাতেও 'রাবাণ' গানের প্রচলন আছে। আবার শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ী অঞ্চলে রাবাণ গানকে 'কেউটিয়া রাবাণ' বলে। 'কেউটিয়া রাবাণ'-এ রামায়ণ আশ্রিত কাহিনীর সঙ্গে লোকায়ত জীবন জড়িয়ে গেছে। তাই রাবণের নাম হয় 'কেউটিয়া রাবাণ'। এই কেউটিয়া রাবাণ পালায় রয়েছে খোল করতাল বাজিয়ে গান গাওয়ার রীতি। নর্তকীর কোনো ভূমিকা থাকে না।

উল্লেখিত অঞ্চলের 'রাবাণ' পালা গানের কাহিনীর অংশবিশেষ দেখানো যেতে পারে —

বন্দনা —

আমি বন্দিবোরে ওরে যত দেবগণ
বন্দিবো বন্দিবো রামের দুইখানি চরণ।
আমি বন্দিবো রে —
রামরে রামরে প্রভু রাম নারায়ণ
রাম বিনে গতি নাই এ তিন ভুবন।
আমি বন্দিবো বন্দিবো রে ...
ধন্দে ... ধাদ... ধাদ।
ছিটগান — কৌশল্যা বন্দো বিধিরে
বাপেই টেরিয়া সীতা
কপালোত তোর বিদ্যা নাই
খালি তোর ফুটানি কাথা।
পালা —
ধূর্ত বলে মহাজন শুনহ বচন।
ছাড়িয়া গেইসে ইন্দ্রজিৎ মারিসে লক্ষ্মণ

এই কোথা হইতে রাবণ অচৈতন্য হৈলা।

পালঙ্ক হইতে রাবণরাজা ঢুলিয়া পড়িলো।

ও তুই পৈতালো

ধাদ-ধাদ-ধাদ।

বাপোই মাঘ মাসিরা জারোত

সাগার আছে ভুতির গোরত

বাপই পৈতালো।

এখানে মূল গীদাল এবং বাদ্যযন্ত্রীরা গানের মধ্য দিয়ে গানের কথা ব্যাখা করেন। কাহিনীর ভেতরে খোসাগানের ন্যায় 'ছিটগান'ও পরিবেশন করা হয়।

কেউটিয়া রাবণ গানের ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে —

ও মোর কাগা গে

কেমন লাখা জুড়িলেন কৈনা

ছান ফেলাইতে হেস্ ফেসাইছে

মোর নদারীটা।

পসন-পাসান করিয়া দেখু

মোর নাদারী হৈছে গাভরী

ওরে ভাগ্যের সীমা নাই।

যার গর্ভে জন্ম নিল রামচন্দ্র গঁসাই পূর্বে রাজা বন্দি গাও

ধর্ম নিরঞ্জন

পছিমে বন্দিয়া গাও

পারুয়ার পঞ্চপীর

উত্তরে কালিকা বন্দং দক্ষিণে সাগর।

পালা — রাবণ কান্দে পুত্রশোকে

ওরে পুত্রহারা হইলাম আমি

জলমের মতে

রাবণ বলে ওরে ধুপ

ওরে বনরে রুচিত

কিভাবে মরিল আমার

পুত্র ইন্দ্রজিৎ

রাবণ কান্দেরে

ধাদ - ধাদ - ধাদ।

দেবতার মস্তক আদি দেখিতে নারে

রাবণ কান্দেরে।

ছিটগান — ও কি পৈতালো

পৈতালে কি ওরে বাপই

ক্যানে ছাড়িলো।

ধাদ - ধাদ - ধাদ।

পাঁচা — রাবণ কান্দেরে ওরে পুত্রশোকে

পুত্র হারা হৈলাম আমি

জলমের মতে

ও রাবণ কান্দেরে

ইন্দ্রজিৎ পড়িল রণে বিধিরে পর্বতের সম।

রাবণ কান্দেরে।

পাত্র মিত্র নিশাচর মন্থন করিয়া

হংনা নামে ধূর্ত একজন দিলেক পেঠেয়া

কাথা শুনিয়া ধূর্ত করিল গমন

রাবণে সাক্ষাত যায়া দিলো দরশন

ধাদ - ধাদ - ধাদ।

ও কি আহা মরি রে

মানসির নদারী কেমন বেড়ালে

দমকিয়া ফেলায় পাও

মোর নদারী ধীরে বেড়ালে

হেসপেসাছে গাও

আর চারিদিনে মোর নদারী

গে হে কাকা

হোবে গে ছাওয়ার মাও

কান্দে রাজা দশানন হে

ভাই মৈলো ভাতিজা মৈলো

পৈরে ঠাই ঠাই

রণস্থলে পৈরে মৈলো কুম্ভকর্ণ ভাই।

মূল গানের মাঝে মাঝে 'ছিটগান' চলতে থাকে। রাবণের শোক এই 'রাবাণ' গানে প্রধান। 'রাবণ কান্দেরে ওরে পুত্র শোকে' এই কথাটি গীদালের কণ্ঠে বারংবার বেজে উঠে।

সত্যপীর

'সত্যপীর' উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সত্যপীর পূজিত হয়ে আসেন। সত্যপীরের কাহিনীকে ঘিরে তৈরী হয়েছে পালানাটক — যা সত্যপীরের গান বলে পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বাড়ীর শুভকার্যের অনুষ্ঠানে এই পালাগান অভিনীত হয়ে আসছে। উত্তরদিনাজপুর জেলার করণদীঘি, চাকুলিয়া, শকুন্তলা, রামগঞ্জ, চোপরা প্রভৃতি এলাকায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ভূটানীর ঘাট, জটেশ্বর ইত্যাদি এলাকার গ্রামাঞ্চলে সত্যপীর বা সৈতপীরের গানের প্রচলন করা যায়। শিলিগুড়ি মহকুমার রঙ্গিয়া, তারাবাড়ী, কোচবিহারের শিতলকুচি, বড়মরিচা, সিতাই, দেওয়ান হাট ও ভেটাগুড়ি অঞ্চলে সত্যপীরের গানের ধারা এখনও অব্যাহত। গৃহস্থের পুত্র সন্তান জন্ম উপলক্ষে এই গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর মিলিতভাবে এই গান পরিবেশন করেন। বিষয়বস্তুতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চমৎকার একটা মিলন দেখা যায়। সারা বাংলাদেশে সত্যপীরের গান পাঁচালী আকারে পরিচিত থাকলেও উত্তরবঙ্গে নাটকের আকারে পরিবেশন মানুষের কাছে আকর্ষক হয়ে উঠেছে।

গিরীন্দ্রনাথ দাসের 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' পুস্তক থেকে জানা যাচ্ছে প্রায় তিনশতাধিক বৎসর কাল আগে থেকে সত্যপীরের কাহিনী নিয়ে বহু কবি পাঁচালী রচনা করেছেন। হিন্দু এবং মুসলিম এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভক্তিভরে সত্যপীরের গান রচনা করেছেন। রচয়িতাদের মধ্যে কবি ফয়জুল্লাকেই অনেকে প্রাচীনতম বলে মনে করেন।

সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে বহু কাহিনী বর্ণিত আছে। মালঞ্চার পালা, শিশুপাল রাজার পালা, হীরা মুচির পালা, শশী বেশ্যার পালা, জসমন্ত সাধুর পালা এরকম বহু কাহিনী নিয়ে সত্যপীরের পাঁচালী রচিত। উত্তরবঙ্গে মালঞ্চার রাজার কাহিনীটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কাহিনীটিই নাট্যাকারে গৃহস্থের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই কাহিনীটির উৎপত্তি সম্পর্কে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ উল্লেখ করেছেন — "সত্যপীরের পিতৃমাতৃদত্ত নাম কেহই অবগত নহে, কিন্তু সত্যপীর' একটি উপাধি বলিয়াই অনুমিত হয়। মৈদলন (মহীদলনহ) নামক কোনোও রাজার কুমারী কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ভগবদিচ্ছায় সত্যপীরের জন্ম হইবার বৃত্তান্ত পুথি এবং গীতে উক্ত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গৌড়ে পাঠান রাজত্বকালে মৈদলন মালঞ্চর রাজা ছিলেন; ..... সত্যপীর হিন্দুবংশজাত ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন পূর্বক তাহার প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁহার মাতামহ এবং অন্যান্য লোক বহু বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামেই সকলই পরাজিত এবং তাঁহার মতানুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সত্যপীরের দ্বারা উত্তরবঙ্গের বহু

লোক ইসলাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের অসাধারণ প্রভাব এপর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পুথি এবং গীতে সত্যপীরের যুদ্ধবিবাদে লিপ্ত হইবার উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি লোকসেবার জন্য যে 'শিরিণির' ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ বা হিংসাবর্জ্জিত।

হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত আছে। 'সত্যনারায়ণ' বিষ্ণু অথবা নারায়ণের বহু নামের মধ্যে একটি নাম মাত্র। সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণের অভিন্নতা সম্বন্ধে সত্যপীরের পুথিতে লিখিত আছে, —

'যেই সত্যনারায়ণ সেই সত্যপীর।
দুই কুলে লৈছে সেবা করিয়া জাহির।।

সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে লিখিত আছে, —

'সত্যপীর নামে পূজা করিবে যবনে।
এরূপে করিবে সেবা যার যেই মনে।।'

সত্যপীর অথবা সত্যনারায়ণের হিংসাবর্জিত অধিকন্তু অপক্ক শিরণী অথবা প্রসাদ হিন্দু মুসলমান সকলরই পক্ষে তাঁহাকে গ্রহণের পথ প্রসারিত করিয়াছিল।''[৯]

বলা যেতে পারে সত্যপীরের পাশাপাশি অন্যান্য পীরদেবতারা যথাক্রমে মানিকপীর, ঝুঁটিয়াপীর, ল্যাংড়াপীর, জ্যাঠাপীর, মখ্দুমপীর, বালাপীর, বদরপীর প্রভৃতি পীরগণ পূজিত হয়ে থাকেন। এই সকল পীরদের মধ্যে সত্যপীরকে নিয়ে নাটকীয় আকারে পালাগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদের পুস্তক থেকে আরো জানা যায়, ''আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে পশ্চিম কামরূপে ইসলাম ধর্মের প্রচার আরব্ধ হইয়াছিল এবং পরে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বহু সাধু সন্ন্যাসী যে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। ইসলামের ভক্তিশাস্ত্রে সাধকগণের বিবিধ সম্প্রদায়ের নাম এবং বিবরণ আছে; প্রথমাবস্থায় যে সকল ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পর্য্যটক ছিলেন এবং তাঁহারা সাধারণতঃ 'পীর', 'দরবেশ' এবং 'ফকির' বলিয়া অভিহিত হইতেন।''[১০] তোরষাপীর, পাগলাপীর, গাজীপীর পাঁচপীর, খোয়াজপীর ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু 'সত্যপীর' হিন্দু এবং মুসলিমদের উভয়ের দ্বারা পূজিত এবং গৃহীত। এই সত্যপীরকে নিয়ে পালা নাটক তৈরী হয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে মনষ্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে অভিনীত হয়ে আসছে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ও বিলাসপুর অঞ্চলে অভিনীত সত্যপীরের একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে —

'পীর বলিছে আমি নাম রাখিব
দুই কুলের মধ্যে আমি সেবা পূজা নিব।

হিঁদুর দেবতারে আমি মোসলমানের পীর।
দুই কুলে নিব সেবা করিয়া জাহির।।
হিঁদুর ঘরে নিব আমি প্রসাদ আর পানি।
আর মোসলমানের ঘরে নিব তিন কড়া শিরনি।।"

(টুঙ্গীদীঘির মহম্মদ জালালউদ্দিন আহমেদের নিকট থেকে সংগৃহীত)

'সত্যপীর' পালাগানের মধ্যে মুসলমানের ধর্মের কথাও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পীর, পয়গম্বর, আউলিয়া, দরবেশ, নবাব-বাদশাদের কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। 'সত্যপীর' পালাগানের মূল গায়ক ফকির। এই ফকির মনে হয় সুফী দরবেশেরই প্রতীকস্বরূপ।

বন্দনা দিয়ে সত্যপীর পালা শুরু হয় —

'পূর্বে রাজা বন্দি গাও মুই ভানু আর ভাস্কর।
উত্তরে কালীকা বন্দং দক্ষিণে সাগর।।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাও মুই পারুয়ার পঞ্চপীর।
যাহার কলেমার গুণে মোক্ষ পায় শরীর।।
আইস মাতা সরস্বতী মাও চাপি হংসরথে,
আসিয়া বইসহ মাও অভাগার কণ্ঠেতে।
মোর কণ্ঠ ছাড়ি মাগো অন্যের কণ্ঠে যাবু।
দোহাই নাগে সত্যপীরের ধর্মের মুণ্ড খাবু।
সত্যপীরের নাম নিয়া পালা করি শুরু
তারপর বন্দি যেবা — এই গানের শুরু।
বন্দি দেবী সরস্বতী পীর পয়গম্বর।
দশজনার চরণ বন্দি সভার মাঝার।।

সত্যপীর পালাগানের অংশগ্রহণকারী সব শিল্পীরাই আসরের মধ্যে গোল হয়ে বসে বন্দনার গান শুরু করেন। আসরে গানের জন্য সহযোগী যন্ত্র হলো খোল, করতাল এবং হারমোনিয়াম। 'বন্দনা' শেষ হলে মূল বা ফকির আসরের মধ্যে উঠে দাঁড়ান। তাঁর হাতে থাকে একটি চামর বা চহর যা বাঁশ দিয়ে তৈরী লাঠিতে যুক্ত থাকে। মূল গীদাল বা ফকিরের দুদিকে নর্তকীরা থাকেন এবং তাঁদের সম্মুখে বৈরাগী বা দোয়ার থাকেন। নর্তকী এবং দোয়ারগণ অভিনয়ের শুরুতে মূল গীদাল বা ফকির কে প্রণাম করেন। মূলগীদাল চামর দিয়ে নর্তকী ও দোয়ারকে

আশীর্বাদ করেন। মূল গীদাল বন্দনা শেষ করে কথা শুরু করেন।

মালঞ্চর রাজা মহিদুর্লভ বা মইদুলব এবং সন্ধ্যাবতীর কাহিনীই উত্তরবঙ্গে প্রচলিত। কাহিনীতে বহু চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। মূলগীদাল, নর্তকী, বৈরাগী বা দোয়ার. মহিদুর্লভ রাজা, সন্ধ্যাবতী, খোদাতাল্লা, দোস্তলবী, জেব্রিল, গুলফুল চরিত্রগুলিই প্রধান।

গীদাল এবং বৈরাগীর মধ্যে দীর্ঘ কথপোকথন রয়েছে। প্রত্যেকটি কথার শেষে মূল গীদাল গনের ধুয়ার ধরেন। নর্তকী এবং বৈরাগী ধুয়া অনুসরণ করে গান ও নৃত্য করতে থাকেন। এই নৃত্যের সঙ্গে মূল গীদালও চামর দুলিয়ে দুলিয়ে যোগদান করেন।

চরিত্রগুলির পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসম্ভব চরিত্রের পরিচিতি অনুসারেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আসরের মধ্যে পোশাকের ভিন্নতা হেতু চরিত্রগুলিকে আলাদা করে নির্দিষ্ট করা যায়। সাধারণ মেক-আপের দ্বারা অভিনেতারা নিজেদের সজ্জিত করেন। দলের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে চরিত্রগুলির সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে সত্যপীরের মূল গায়ককে ফকির বলা হয়। গানে স্ত্রীবেশধারী নর্তকীদের পরিচয়ছিল ছোকরা হিসেবে। সত্যপীরের গানে ফকিরের বেশভূষা একটু আলাদা ধরণের।

"ফকিরের গায়ে থাকত পায়ের গোড়ালি থেকে সাদা ঢোলা বুক খোলা শেরওয়ানি (পাঞ্জাবীর মত)। পেছনে পিঠের ওপরে লাল পাপড়ের সুতার সেলাই দিয়ে আটকান 'তাস' এর ইসকা বন চিহ্ন। মাথায় বিড়া জাতীয় বাঁশের কঞ্চি অথবা বাখারি দিয়ে তৈরী গোলাকার চক্র এক অদ্ভুত বেশ। এটা মনে হয় মুসলিমদের পীর পয়গম্বর এবং আউলিয়া দরবেশদের প্রতীক চিহ্ন।"[১১]

মূলগায়ক বা ফকির গান শুরুতে গানের মুখাংশ গেয়ে ছেড়ে দিলে। সেই গান দোয়ারী, বাজানদাররা গাইতেন। গানের তালে তালে ছোকরারা নাচ করতেন। কাহিনী বহির্ভূত কিছু ধুয়া গানের ব্যবহার দেখা যায় সত্যপীর পালায় —

"আল্লা বল ভাইরে নবী কর সার।
নবী হইতে উন্নত সবে হৈয়া যাবে পার।।

কিংবা

"বেলা গেল, বেলা গেল পামর মন
বেলা নাইরে আর,
দুষ্কের বেলা ডুবিয়া গেলে
হবে অন্ধকার।"

কাহিনীবহির্ভূত হলেও 'ধুয়া' গানের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর দুটি ধুয়া গান সত্যপীরের মধ্যে দেখানো যেতে পারে —

"চান্দের বাজার চান্দের বাজার
দিনে দিনে, হইল আন্ধার।
ও বনের কুকিলা রে
ওরে এদমের ভরসা নাই,
হায়রে, হায়।
কুকিলার কুহু, কুহু বাছা
ময়ূরের পেখম
ওরে নিশাপ্রহর রাত্রিকালে
দেখাইলে স্বপন
বনের কুকিলারে হে।

অন্য আর একটি — "কি করিব কোথায় যাব
না দেখি উপায়
ফাপর খায়া দ্যাহার মনুরা
ছাড়িয়া যাবার চায়।"

কাহিনীর গতি এবং নাটকীয়তা বৃদ্ধিতে এই ধুয়াগানগুলির গুরুত্ব রয়েছে। সর্বোপরি বলতে হয় এই সত্যপীর পালাগানে হিন্দু-মুসলমানের প্রগাঢ় সম্প্রীতির ভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে।

চার যুগের গান

রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং গোয়ালপাড়া, এলাকার হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় 'চার যুগের গান'-এর প্রসার দেখা যায়। দোতরা, কুশান, বিষহরি পালাগানের পাশাপাশি 'চারযুগের গান'-এর পরিচিতি পাওয়া যায়। চারযুগের গানের কাহিনী হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের তত্ত্ব কথা দিয়ে তৈরী। 'চার যুগের গান' নাটকের আকারে মঞ্চে পরিবেশিত হয়। দোতরা-কুশানে বহু চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। চারযুগের গানে দুটি চরিত্র প্রধান। তাঁরাই পরস্পর প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর দিবেন। তাঁদেরকে সহযোগিতা করবেন বাজানদারগণ।

মঞ্চ পরিকল্পনাতে কোনো নতুনত্ব নেই। অন্যান্য পালাগানে মাটিতে বৃত্তাকারে বাজানদাররা বসেন। এই

পালাগানেও বাজানদাররা বৃত্তাকারে বসেন। সাধারণত, দোতরা-কুশান পালায় যে বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় সে সকল বাদ্যযন্ত্র চার যুগের গানে ব্যবহৃত হয় না। দোতরা, ব্যানা, খোল-করতালের কোনোরকম ব্যবহার নেই। এখানে রয়েছে করকা এবং সানাইয়ের মতো একরকম বাঁশী। এই করকা এবং সানাইয়ের মতো বাঁশীটি গান-পরিবেশনের এলাকা থেকেই প্রস্তুত হয়। এই 'করকা' বাদ্যযন্ত্রটি একেবারে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র। বিয়ে বাড়ী এবং মহরমের সময় এই করকা বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষভাবে আদৃত হয়ে থাকে।

চারযুগের গানের প্রধান যে দুটি চরিত্রের কথা বলা হলো সেই দুটি চরিত্র একটি হিন্দু ধর্মের এবং আর একটি মুসলিম ধর্মের মানুষ। দুই ধর্মের কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে চরিত্র দুটি প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। কবিগানের সঙ্গে ঠিক তুলনা করা চলে না। কবিগানে আলাদা দু'দল থেকে কবিয়ালরা আসেন। কবিগানের আসরে তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করেন। চারযুগের গানের দুটি প্রধান চরিত্র একটি দলের। তাঁদের বিষয়বস্তু পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে। ফলে পরস্পরের প্রতি কোনো আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। বরং উভয়ের বক্তব্য শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের গভীর কথা তাঁরা তুলে ধরেন। আরো উল্লেখযোগ্য হলো হিন্দু প্রতিনিধি মুসলিম প্রতিনিধির কাছে জানতে চাইবেন জগন্নাথ দেব সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কি না। মুসলিম প্রতিনিধি হিন্দু-প্রতিনিধির কাছে জানতে চাইবেন তিনি মক্কা-মদিনার কথা কী জানেন ? হিন্দু ধর্মের বিষয়বস্তু মুসলিমকে বলতে হবে এবং হিন্দুকে বলতে হবে মুসলমানের ধর্ম কথা। ফলে পরস্পরের ধর্মের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধার ভাব আরো বিকশিত হয়।

'চারযুগের গান' বলতে সাধারণ বোঝায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের কথা। এই চারটি যুগের কথা গানের ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে আসে। আবার কেউ কেউ মনে করেন মানবদেহের ক্রমবিকাশের চারটি স্তরের কথা — শৈশব, কৈশর, যৌবন এবং বার্ধক্য। দেহকে কেন্দ্র করে দেহাতীত জীবনের কথাও এই চার যুগের গানে ধরা পড়ে।

এই পালাগানে যে চরিত্রদুটির কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে যিনি মূল থাকেন তিনি সাধারণত মুসলিম সমাজেরই লোক হয়ে থাকেন। ফলত: এই পালাগানের মূল চর্চা মুসলিম নেতৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

অন্যান্য পালাগানের আসর বন্দনার মতো এই গানেও আসর বন্দনা করা হয়। আসর বন্দনার মূল গীদাল উঠে দাঁড়ান। তাঁর হাতে একটি চামর থাকে। এই চামরটি কাপড় দিয়ে তৈরী। দেবজ্ঞানে এই চামরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকেন। চার যুগের গানে কোনো নর্তকী থাকে না।

আল্লা বন্দনা দিয়ে বন্দনার শুরু হয়।

পহেলা বন্দিব আমি আল্লার পরবর্তী কর
ও আল্লার দস্তে বন্দি গাও মুই নবী পয়গম্বর
ঐ নারীরে জামাতা যে বন্দং যাহার মর্দ্দ আলি
ইমাম হোসেন বন্দি গাব মা ফতেমার বেটা
উম্মদ কারণে মদ্দের শির বা গেইকে কাটা
ইমাম হোসেন বন্দি গাব মুই রসুলের নাতী
বেহেস্তের দুয়ারে দুই ভাই জ্বলায় পঞ্চবাতি
ওসমা বিবির পুত্র বন্দং গাড়ী জিন্দা পীর
অল্প বয়সে মোর নৈদের চান্দ হইয়াছে ফকির
সন্ধ্যাবতীর পুত্র বন্দং নামে সদ্যপীর
মালঞ্চ নগরে করে অদ্ভুত মাহির

পূবে রাজা বন্দিগাব ভানু ভাষঙ্কর
ওহে উত্তরে কালিকা বন্দং দক্ষিণে সাগর।
পশ্চিমে বন্দনা হইল পারুয়ার মোকাম
আশি হাজার পীর পয়গম্বর নিত্ পড়ে কোরাণ
এতশ বন্দনা গাইতে হবে অনেকক্ষণ
একে করে প্রণাম হইল দশের চরণ
এতশ বন্দনা গাইতে কেউ নাই আর বাকি
ছালাম করিয়া বন্দনা হইলো আর জল্লার খাকি।

বন্দনা শেষ হলে মূল গীদাল প্রতিপক্ষকে 'শ্যামদেশ' বলে সম্বোধন করে বলছেন —

দেখ বাবা শ্যাম দেশ, এই আসরের মধ্যে আমি একলাখ চব্বিশ হাজার পীর পয়গম্বর বন্দনা করিলাম, ওলিওলি হাটঘাট, মক্কা মদিনা বন্দনা করিলাম ইয়ার মধ্যে কোন কোন পীর বন্দনা হইল কোন কোন পীর এবেয়া গেইল, আমাকে একটা একটা করিয়া তোলাপদ করিয়া দেন।

শ্যামদেশ মূল গীদাল অর্থাৎ ফকিরকে উত্তর দিচ্ছেন — ফকির সাহেব — সালাম সাহেম, পারুয়ার

মোকাম আশি হাজার পীর পয়গম্বর নিত্ পড়ে কোরাণ। বলেন তো ফকির সাহেম, প্রথমে কোন পীরের বন্দনা গাহিয়াছেন ?

এই ভাবে নাটকীয় আকারে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই পালায় মুসলিম প্রতিনিধি মূল গীদাল বা ফকির হিন্দুর দেবতাদের মাহাত্ম্য নিয়ে প্রশ্ন ধরেন হিন্দু প্রতিনিধি শ্যামদেশকে।

'জগন্নাথ ক্ষেত্র' নিয়ে মূল গীদাল বলছেন —

বন্দং প্রভু জগন্নাথ সকল তীর্থের বড়।
তিন কোন পৃথিবীর লোক সেইখানে হয় জরো।।
জগন্নাথ যাইতে শ্যামদেশ পন্থে দূরাদূরি।
জগন্নাথ যারা যাইবেন বাবা জোড়া বেতের বাড়ি।।
জগন্নাথ যাইতে পন্থে বিষম কাঁটা।
জগন্নাথ যাইতে খাইবেন খোলা হাড়ির ঝাঁটা।।

জগন্নাথ যার বা যেমন মন।
জগন্নাথ যারা পাইবেন ছেইলার দরশন।।
শূদ্রলোকে আন্দে ভাত ব্রাহ্মণ বসিয়া খায়।
মহাপ্রসাদ বলিয়া সেইভাত বন্দরে বেকায়।।
কহিলাম কহিলাম শ্যামদেশ ছাওয়ালের উত্তর
আমার সঙ্গে চল এখন শ্রী জগন্নাথ কেত্তর।

এখানে শেষ হওয়ার সাথে বাজানদারগণ একসঙ্গে গান গেয়ে ওঠেন —

"ও রসিক দাঁড়াও
আরে রসিক দাঁড়াও তিলেক
দাঁড়াও আমি দেখিয়া নেই
ও রসিক — জনমের মত রসিক দাঁড়াও
আমি দেখিয়া নেই।"

এই সঙ্গীত উপস্থাপিত হওয়ার পর শ্যামদেশ মূল গীদাল বা ফকিরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন —

``যেও কথা কইলেন গুরু মোর একটাও নাই মনে
লক্ষভাবে পোছোং কথা দেহাটার কারণে
যখন ছিল গুরু মোর নাথ নৈরাকার
ফতেমা ছিল কোথানে আল্লা কিসের পর
কোন হরপে াসমান পয়দা কোন হরপে জামিন
আসমান যখন না আছিল গুরু মোর, কোথায় ছিল চাঁন
মানব জনম না ছিল মোর কোথায় ছিল মান।
আসমান যখন না ছিল মোর কোথায় ছিল তারা
ইন্দ্রেরাজা না ছিল মোর কোথায় ছিল ঝরা
গাছবৃক্ষ না ছিল মোর কোথায় ছিল জল।
গাভী গোটা না আছিল গুরু মোর কোথায় ছিল ঘিউ।
মানব জনম না আছিল গুরু মোর কোথায় ছিল জিউ।।
আসমান জমিন পোড়া গেইচে গুরু মোর কোথায় গেইকে ছাই।
পর প্যাটোত যে কায় পোড়া গেইকে আছিলাম কারও ঠাঁই।``
যদ্যাপি কহিতে পাব গুরু মোর ছাওয়ালের উত্তর।
তোমার সঙ্গে চলিয়া যাবো জগন্নাথ ক্ষেত্তর।।

এইভাবে সঙ্গীত ও গদ্যসংলাপের মধ্য দিয়ে প্রশ্নোত্তর করে করে কাহিনী এগিয়ে চলে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য পালানাটকের থেকে পালাগানের উপস্থাপন কৌশল এবং বিষয়বস্তু একেবারে ভিন্ন। সামাজিক সম্প্রীতির দিক থেকে এই পালাগানের মূল্য অপরিসীম।

চোর-চুন্নী

জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী দেওয়ানগঞ্জ হেমকুমারীর এলাকার লোকসম্পদ ঘিরে চোর-চুন্নী পালাগানের পরিধি। দিনাজপুর ও রঙপুরেও এ গানের প্রচলন আছে। চোরচুন্নী গান বৎসরের বিশেষ একটি সময়ে গাওয়া হয়। কালী পূজার দিন বা তারপর থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত এ গান গাওয়া হয়[১২] ভৌমিক : প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত আবার আর একটি লেখায় দেখা যায় কার্তিক মাসে চোরচুন্নী গান গাওয়ার কথা ''কালী পূজার পনের দিন আগে থেকে শুরু করে কালীপূজার আগের রাত্রি পর্যন্ত গানগুলি গাইবার কথা লিখেছেন সনৎকুমার মিত্র।[১৩] নির্মলেন্দুবাবু অবশ্য বিভিন্ন স্থানে চোরচুন্নী গানের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথা বলেছেন। যেমন তিস্তার পশ্চিম দিকে পাহাড়পুর ইত্যাদি অঞ্চলে দীপান্বিতা অমাবস্যার পরবর্তী অষ্টমী তিথি থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই গান চলে। আবার ধূপগুড়িতে দীপান্বিতা অমাবস্যার পরবর্তী একাদশী থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হয়। নানা সময়ের উল্লেখ থেকে নির্মলেন্দুবাবু একটি সাধারণ সূত্রে এসেছেন দীপান্বিতা অমাবস্যার প্রতিপদ থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।[১৪] আবার বিশ্বদেববাবুর প্রবন্ধে পাই কালীপূজার রাত থেকে আট দশ দিন ধরে চোরচুন্নীর দল বাড়ি বাড়ি পালা গান গেয়ে বেড়ায়। এসব লেখার সঙ্গে কিন্তু সনৎবাবুর সংযোজনে দেওয়া সময়কালের কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। গিরিজাশঙ্কর রায় চোরচুরনী গানের বিবর্তন প্রবন্ধে বলেছেন ''দীপান্বিতার সময় থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত'' এই গানের সময়।[১৫] চোরচুন্নী গান কে নির্মলেন্দু বাবু আনুষ্ঠানিক গান বলেছেন। লক্ষণীয় যে 'গান' হিসেবেই এটি পরিচিত। বর্তমানে যাঁরা এ নিয়ে লিখছেন তাঁরা একে সতর্কভাবে 'পালা' নামে অভিহিত করছেন এবং এর প্রকৃতি পরিচয় দিতে গিয়ে একে বলছেন গীতিধর্মী লোকনাট্য,[১৬] অন্যপক্ষে স্বয়ং সম্পাদক পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন 'গান বা পালা'[১৭]। এ থেকে একটি কথা বোঝা যায়। চোরচুরণী লোক সমাজে গান হিসেবেই পরিচিত হলেও এর উক্তি প্রত্যুক্তিময় প্রকৃতি দেখেই একে পালা বলা হয়ে থাকে। নির্মলেন্দুবাবু লিখেছেন এর সমস্ত গানই উক্তিপ্রত্যুক্তি মূলক। এই উক্তি প্রত্যুক্তিই নাট্য সংলাপের ভূমিকা পালন করে।

চোর-চুন্নী পালাগানের আসর সজ্জা পালাটিয়া দোতরা বা কুশান গানের অনুরূপ নয়। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় বলেন — ''চোর-চুন্নী গানের কোন বিশেষ মঞ্চ বা আসর থাকে না। গৃহস্থের উঠানে চোর চুরণীর দল গান গেয়ে থাকে। দশ-বারো বা ততোধিক কিশোর বা যুবকরাই গানে অংশগ্রহণ করে। এই দলের একজন চুররীর ভূমিকায় থাকবে। অন্যান্যরা দোহার এবং বাদ্যযন্ত্রের কাজ করবে।''[১৮] সাধারণত গৃহস্থের উঠানে বা বাইরের খোলা জায়গায় দশ-বারোজন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পালাটিয়া, দোতরা কিংবা কুশান গানের মঞ্চ গান শুরু হওয়ার আগে থেকেই প্রায় সজ্জিত হয়ে থাকে। চোর-চুন্নী পালাগানে সেরকম কোনো পূর্ব থেকে

প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে না। দশ-বারোজন শিল্পীর মধ্যে ৪ থেকে ৫ জন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেন। খোল, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশী — এই চারটিই যন্ত্রই সাধারণত বাজানদাররা ব্যবহার করে থাকেন। অন্যান্য পালাগানে মূলগীদাল যে রকম পরিচ্ছন্ন পোষাক পড়ে থাকেন এই পালাগানেও সেরকম দেখা যায় মূল গীদালের সঙ্গে ৪ থেকে ৫ জন ছেলেরা মেয়ের সাজে নর্তকী হয়ে নৃত্য প্রদর্শন করেন। মূল গীদালের সঙ্গে দোহার আকর্ষক পোষাকে আসরে অবতীর্ণ হন।

কাহিনীতে প্রবেশ করার পূর্বে মূল-গীদাল বন্দনা শুরু করেন।

ও মুই বন্দনা করেছু আজি
ও মা শ্যাম কালি
ওরে জোর হস্তে করিয়া মাগো
করেছু ভকতি
আ-হা-র তুমি কালি কমলা রানী
এমা জগত তারিনী
ওরে তোর চরণ সুহারণ করি
দে পদ ধূলি
জোড় হাতে মা করেছু ভকতি।
এ-মা যদি পুরাস আশা
হাউসে রঙ্গে করিম পূজা
ওরে মনের আশা সর্বনাশা
না করাইস আজি
আহার আমি রতি সুরোমতি
এমা অন্যায় না নিস মে
তোর চরণ সুহারণ করি
জোড় হাতে করি
চোর করিবার যাচ্ছো মুই আজি"

"এখানে 'শ্যামাকালী'-র বন্দনার একটা অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। যে সময়টায় চোর-চুরনী গানের মরশুম সেই সময়ে কালীপূজার উৎসব। অতএব পল্লী কবির রচনায় শ্যাম-কালীর প্রভাব পড়েছে।"[১৯]

চোর-চুরণী গানকে নির্মলেন্দু বাবু বলেছেন আনুষ্ঠানিক গান। অর্থাৎ এগানের মূলে ছিল কোনো আচার পালনের প্রথা। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার প্রচলিত একটি প্রথার উল্লেখ তিনি করেছেন। শ্যামা পূজার পরদিন ভোরবেলা সং সেজে একদল বালক চোরের অভিনয় করে। একজন চোর সাজে; অন্য বালকেরা থেকে চীৎকার করে গৃহস্থকে সজাগ করে। এই চোরের সং সেজে বালকেরা গৃহস্থবাড়ি থেকে টাকা পয়সা বা মিষ্টান্ন পায়। জলপাইগুড়ি জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে মহালয়ার দিন কিছু চুরি করে আনার এবং দীপান্বিতার রাত্রে সবার অজান্তে তা ফিরিয়ে দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। এর দ্বারা নাকি সারা বৎসর স্বচ্ছন্দে চুরি করে ভালো রোজগার করা যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরণের প্রথা প্রচলিত আছে। এই ধরণের প্রথার ব্যাখ্যা করে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন "কালী পূজার দিন চুরি করিতে পারিলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া নির্ভাবনায় চুরি করিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারা যায়।"[২০] কিন্তু এর বাইরে অন্য কোনো কারণ থাকা সম্ভব। যাদু বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবেও এরকম চুরির প্রথা প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে।

এই ধরনের প্রথা সারা বাংলাদেশে প্রচলিত থাকলেও কেবল জলপাইগুড়ি জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের আর কোনো কোনো জায়গায় এ নিয়ে গান রচিত হয়েছে। লোক বিশ্বাস বা লোক প্রথার প্রচলন এখন অনেক কম; চোর চুন্নীগানের প্রচলন কিন্তু এখনও আছে। তার মধ্যে ধরা পড়েছে চোর চুন্নীর অভাব, তাদের সাংসারিক পরিস্থিতি, প্রেম ও বিচ্ছেদ, শঙ্কা ও সাহসের নানা পরিচয়।

"চোর চুরণী গানের দুটি দিক। একটি চোর চুন্নীর সামাজিক আর্থিক পরিচয় — চোরের চুরি করে আনা আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়া, আর অন্যদিকে আছে চোর চুন্নীর গানে সারা বৎসরের সালতামামি।"[২১] প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত চোর চুন্নীর গান যখন পালা নাটক হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তখন তার মধ্যে উপরোক্ত দুটি বিষয় থাকতে পারে, কিংবা এর কোনো একটি বিষয় থাকতে পারে। এই সঙ্গে দেখা যায় চোর চুন্নী গানে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় প্রসঙ্গ অনেকটা জায়গা পাচ্ছে। চৌরকর্ম সিদ্ধির জন্য কালীর পূজা প্রসিদ্ধ, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ কেন এভাবে যুক্ত হল তার কারণ স্পষ্ট নয়। কাহিনীর আরম্ভে শ্যামা বন্দনা বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই গীদাল শ্যামা বন্দনা করে আসরে নামেন। কিন্তু চোর-চক্রবর্তী হিসেবে রাধা-কৃষ্ণের বন্দনার মানে নিশ্চয় ভিন্ন। কৃষ্ণকে চোরের সঙ্গে এবং রাধাকে চুন্নীর সঙ্গে তুলনা করে যে কৃষ্ণ বন্দনা তাতে কৃষ্ণকেই সব জীবের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আবার কোনো চোর-চুন্নী পালার অনুষ্ঠানে চোর-চক্রপতিকে বন্দনা করার রেওয়াজ দেখা যায়। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের 'চোর-চুন্নী'র বন্দনা অংশ প্রণিধানযোগ্য।

বন্দনা করু মুই চোর চকরপতি
সেই চোরের চুন্নী বন্ধু রাধা-বিনোদনী
সে চোর যদি মনে করে দিনতে ডাকাতি পড়ে
কারয় সাদ্দি ধরিতে পারে
সে-চোর পুরাণতে শুনি। ভয় হাতাশ কিছুই করেযে না;
যারে বাড়ীতে যায় তাঁহে কানা।
দ্যাখেয়া দিলে তাও দ্যাখে না
ও পড়শীর কানাকানি
ওই বন্ধু চোরা জগৎ মেরা চোরের শিরোমণী"।[২২]

এই বন্দনাতে — মূল গীদাল চোর চক্রপতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা বিনোদিনীকে বন্দনা করেছেন। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায়ের মত এখানেও স্মরণযোগ্য — "কবি চোরকে বন্দনা করেনি। বন্দনা করেন 'চোর চক্রপতি'-কে। দ্বিতীয় পংক্তিতে রাধা বিনোদিনীকেও বন্দনা করা হয়েছে।"[২৩]

চোর-চুন্নী পালাগান পরিবেশনে তিন রকম কাহিনীর উপস্থাপন ঘটে। প্রথমভাগে রাধাকৃষ্ণ কথা নির্ভর সঙ্গীত। দ্বিতীয়ভাগে চোর-চুন্নীর সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে কাহিনী পরিবেশিত হয়। তৃতীয় ভাগে একটি প্রচলিত কাহিনী ময়নাগুড়ির উত্তরাঞ্চলে শোনা যায় — সেই কাহিনী পরিবেশিত হয়। চক্রবর্তী নামে একজন চোর অদ্ভুত মায়া ও যাদু লাগিয়ে চুরি করতো, কোনোদিন ধরা পড়তো না। সেই চক্রবর্তী চোরের কীর্তি নিয়ে তৃতীয়ভাগের কাহিনী। প্রথম ভাগের কাহিনী চোর এবং চুন্নীর উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

মূল গীদালই গান শুরু করবেন। তিনিই চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং গান শুরু করবেন। আবার তিনি চুন্নীরূপে কখনো গান শুরু করবেন। অনুরূপভাবে দোহার চুন্নী সেজে গান করছেন বা কখনো চোররূপে উত্তর দিচ্ছেন। মূল গীদাল এবং দোহার চোর চুন্নীরূপে বা চুন্নী-চোররূপে আসরে ভূমিকা পালন করেন। আসরে সমবেত শিল্পীরা কখনো চোরের গীতে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন আবার কখনো চুন্নীর গীতে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। এই চোর-চুন্নী নাট্য পালাগানে সঙ্গীত মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মত এই স্থানে প্রণিধানযোগ্য — "চোর-চুন্নীর সমস্ত গান চোর ও চোরণীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি। হয় চোর চোরণীকে কহিতেছে, নতুবা চোরনী চোরকে কহিতেছে। এই প্রসঙ্গে, গায়নকালীন একটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ করিবার মতো। চোর যখন চোরণীকে বা চোরণী যখন চোরকে কোনো কথা বলিতেছে তখন যাহার উদ্দেশে গানটি গীত হইতেছে, সেও বক্তার সহিত গান গাহিয়া থাকে। গায়ন-কালীন এই রীতি নাটকাদিতেও পালিত হইয়া থাকে।"[২৪]

প্রথমভগের কাহিনী চুন্নীর গীত দিয়ে শুরু। মূল গীদাল শুরু করেন —

"ওরে হায়গো সখী বড়ই
নৈজ্জা দিলো শ্যাম-কালা।
ওরে কদমডালে বাজায় বাঁশী
ঠিক দুফোর বেলা
আ-হার বাঁশিটা তোর এতয় বোল ধরা
ডাকায় মোর নাম ধরিয়া
ওরে এমন মোহন বাঁশী কী সুন্দর বাজে
কী-বা আছে তোর বাঁশীটাতে
আ-হারে নন্দের বেটা চিকনরে কালা
কেনে দিলো এতয় জ্বালা
ওরে সেই জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচে না
হায়রে যাতনা কতয় শুনিম বাঁশির বাদে।

এই গানে কিন্তু রাধার আসন্তোষের কথা নেই বরং ঈপ্সার কথাই আছে। অর্থাৎ কৃষ্ণমুখী রাধার প্রেমের আকুলতাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সেই আকুলতা কৃষ্ণের বঁশির ডাকে জন্মেছে, আর তা কৃষ্ণকেই আকর্ষণ করছে। কৃষ্ণের বাঁশির ডাকে প্রেমকাতর রাধার কথা এই গানে ব্যক্ত হয়েছে। চুন্নীর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যে প্রস্তাবনা হল তার উত্তর চোরের সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। আমাদের সংগৃহীত পালায় চোরের উক্তিতে, ঠিক প্রেমাকর্ষণ নেই আছে সাংসারিক পরিস্থিতির কথা। একই পালাগানের প্রথমভাগের কাহিনী শেষ হতেই দ্বিতীয় ভাগের কাহিনী শুরু হবে। এই ভাগেই চোর চুন্নীর সামাজিক অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

নির্মলেন্দুবাবু চোর চুরনী গানের বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে চোর চুরনীর গার্হস্থ্য জীবনের কথা। পরের অংশে পাই গ্রামের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী।[২৫]

সংযোজিত গানগুলিতে দুই দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমাংশে প্রেম প্রসঙ্গই বড়। তবু তার মধ্যে চোরের কথা পাই —

ওগো কুত্তি গেলো ওগে চুন্নী
একটা কথা শুনেক মোর।
ওগে চট করিয়া খাবার দে মোক

করিবার যাম গে চোর।
ওগো যা কেনে তুই তাড়াতাড়ি
আর না করিস তুইগে দেরী
সাজা পড়া করো মুই
আ-হা-র দেখিনু মুই গণনা করি
একঠে আছে গে টাকা
এলা যদি কুনমতে পারো আনিবার
তাহলে কি অভাব গে হামার

নির্মলেন্দু বাবু যে সব গীতের সংকলন করেছেন তার একটি অংশে দেখতে পাই চোর বড় বাড়িতে চুরি করবার কথা বলে ঃ

চুন্নী নামজাদা মোর নাম
ছোট ঘরে মন না চায়
এলা বড় ঘরত করিম কাম।[২৬]

চোরের কথার উত্তরে চুন্নীর নিঃসঙ্গতার দুঃখের কথা তার গানে ব্যক্ত হয় —

ওরে পরার নারীক ভালোবাসিস
নিজের নারীকে মন্দ বাসিস
এমন কি তোর চলন গিলা
ওরে এমন করিয়া মোর বিছানাও
না থাকিস আসিয়া

চুন্নীর গানে চোরের পর-নারীর প্রতি প্রেমাসক্তি ফুটে উঠেছে। আবার কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পরকীয়া সম্পর্কের রূপ ও ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

প্রেম করিয়া হোল নিদয়া
মোক কি মারিবো কান্দেয়া
ওরে এমনভাবে মধুর সুরে
বাঁশী বাজাইসনা।

শুধু তাই নয় চুন্নী যমুনার ঘাটে ছল করে কৃষ্ণকে দেখতে যেতে চায় অথচ তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না —

মুই বোলে ছল

করিয়া যাও তোক দেখিবার

বাড়ি হাতে না দেয় বিরিবার।

এই কথা শুনে চোর যে কথা বলে তাতে প্রেমের এই আকর্ষণটাই অকস্মাৎ তত্ত্বজ্ঞানে নষ্ট হয়ে যায় —

"চুন্নী কেবা তুমি কেবা আমি

কেবা হবে কার

এ সংসারে দেকগে চন্নী কান্দাকাটায় সার।"

এসব উক্তি প্রত্যুক্তি থেকে মনে হয় চোর-চুন্নী গানের ঐ অংশে নরনারীর প্রেমই গানের উপজীব্য। যেখানে চুন্নী চোরের সঙ্গে মিলনের আকূতি জানায় সেকানে চোরের বাঁশির ডাকে সেই আকর্ষণ উদগ্র হয়ে ওঠে। অথচ চোরকে সে পায় না। চুন্নীর গানে পাই —

"আজি কথায় গেলি আমায় ছাড়ি

ওকি ও মোর প্রেম চরা

ওরে এমনভাবে বারে বারে

মোক আর কান্দাসনা।"

তখন চোর যে প্রেমচোর তা স্পষ্ট হয়ে যায়। চুন্নী আবার গায় —

"এমন বয়সে গেলো ছাড়িয়া

ও তোর কঠোর হিয়া

ওরে এমনভাবে গেল ছাড়ি

মুই নারীটা জানয় না ...

চুন্নীর প্রেমের আকুলতা যে প্রেমিকের জন্য, সে তার স্বামী। গানের একটি উক্তিতে পাই —

তুই চরা সোয়ামী হয়া

ও মোক গেলো মারিয়া

ওরে যাবার বেলা কেনে তুই মোক

না গেলো কয়া।

কাজেই গানের প্রথম দিকে কালার বাঁশির ইঙ্গিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অনুষঙ্গ বহন করে আনলেও তাতে নিঃসঙ্গ চুরণীর প্রেমকাতরতার চিত্রই মুখ্য।

চুরণীর উত্তরে চোর জানায় —

"ওরে প্রেমপিপাসা তোর গে চুন্নী
মিটান আজি ভালো করি"

এসব উক্তিতে চোর চুরণীর প্রেমের চিত্রই মুখ্য।

ঋণের দায়ে জর্জরিত চোর-চুন্নীর বাড়ীতে মহাজনের নিত্য তাগাদা এবং চোরের অনুপস্থিতিতে চুন্নীকে বিরক্ত করার কথা গানের মধ্যে প্রকাশিত।

চুন্নীর গীত ঃ ওরে বাড়ি আসিলো ভালো করিলো শুনেক চরা বিবরণ।
ওরে তোর বাদে প্রত্যেক দিন হছে মোর মরণ।
আহার এলায় আসিয়া গেলেক দেউনিয়া চরা কয়া গেলেক মোক।
ওরে আজিকার আতিক্ষা বাড়িতে চরা নবার কইসে তোক।
আজিবোলে আসিবে আইতোত।

চোরের গান ঃ আজি চট্ করিয়া উঠগে চুন্নী, জ্বলাগে বাতী
ওগে ঘরের ভিতর কেনে তুই হের কান্দোছিত বসি।
আর বাতিটা জ্বলেয়া চুন্নী ও তুই দে খুলি।
খালি খালি কান্দিস না বসি

সংসারের নানাবিধ সমস্যা চোর কিংবা চুন্নীর গীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চুরনীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, চোরের ক্ষমতা অক্ষমতা এসব গানে উঠে আসে।

'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের সংকলন অংশে দেখি চুরণী পূজার সময় চন্দ্রহার চায় —

চরারে আসিছে পূজার বাজার
নাগে মোক এইসন চন্দ্রহার
দিনে দিনে দিন যাছে মোর
করেক তুই বিচার,
নারী উজানি বাজার।[২৭]

চোর সেখানে বলছে — "চুন্নী গে
দিবার নাই পারিম চন্দ্রহার"[২৮]

কেননা পাটের বাজার মন্দা।

লোকসঙ্গীত যেহেতু কোনো নির্দিষ্টরূপে স্থির থাকে না সেজন্য এইগান সবদিন গাওয়া হয় না। তার বদলে অন্য

সমস্যা চলে আছে। আমাদের সংগৃহীত অংশে এসেছে মেয়ের বিয়ের সমস্যা চুন্নীর কথায় চোর বলে —

বিয়ার কথা কবার কছিত
শুনেক ওগো চুন্নী মাই।
এ্যালা হেসে দোসরা নিয়ম
আগিলা মতন নাই।।

তখন মেয়ের বিয়ের অনেক খরচ

মেট্রিক পড়ালার বাড়িসে সম্মান
ও তাক বেটি করিলে দান
ওগে হাজার টাকা খরচ নাগে তামাম জিনিস
আরো নাগে বেটিটা বিদ্বান।

তাছাড়া — খাট পালঙ্ক ছাইকেল ঘড়ি
রেডিওটা দেওয়া চাই।
অ্যালা হইসে দোসরা নিয়ম
আগিলা মতন নাই।

অনেক খরচ করে মেয়ের বিয়ে হলো কিন্তু জামাই পাগল। সে হিসেব নিকেশ জানেনা চুরনীর দুঃখ গানে ফুটে ওঠে।

ওরে কিসোত কি কাম কল্লো চরা
কার বুদ্ধি তুই ধরিয়া
ওরে কুঠে হাতে আনিলো জামাই সাদা পাগেলা
আ-হা-র ঘরের মধ্যে মোর এ্যাকেনা ছাওয়া
ও তার নামটা হৈল মতিবালা
ও রূপে-গুণে দেখান সুয়ান
স্বামী পাগেলা
মহা দুখোত ফেলালে ছাওয়া।

কাজেই চুরনীর আক্ষেপের শেষ নেই। চোর চুরণীর গানের এটা দ্বিতীয় অংশ। এরপর পাই দেশের পরিস্থিতির কথা অনেকটা গম্ভীরা গানের রিপোর্টিং-এর মত সালতামামী। এই অংশের সঙ্গে চৌর্যবৃত্তির কোনো যোগ নেই

কেবল চোর চুরণী এই গানের চরিত্র মাত্র। এই অংশে "একবছরের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও নৈসর্গিক ঘটনার সালতামামী"[২৯] পাওয়া যায়।

"ওরে ইন্দিরা গান্ধী হয়য়া মন্ত্রী
নয়া আইন করিলো জারি
ওরে রাস্তার বগলে কত লোকের
ভাঙ্গিয়া দিলো ঘরবাড়ী
আ-হা-রে ঘর ভাঙ্গেছে দালান ভাঙ্গেছে
ও ভাই আরো কত কি,
ওগে দোমনি হাটের জালিয়াটাবির কল দিলো কাটি
এমন আইন করিলেক জারি।"

পালা নাটকের কাহিনীর অগ্রগতির মধ্যে এ-রকম অনেক বিষয় নিয়ে গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি সামাজিক অবস্থার ছবিও উঠে আসে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ এইভাবে চোরচুন্নী গানে স্থান পায়।

চুন্নী চোরকে বলছেন —

যা ক্যানে তুই ওরে চরা সরকারী হাসপাতালে
ওরে মিছায় না কও তোকরে চরা যাছে কত লোক
"আহারে কত সুবিধা করিসে সরকার
ও দ্যায় হলে অপ্রাশন।
একশত পাঁচটাকা বোলে করেছেরে দান
তুইও যায়া হ'রে অপ্রাশন।"

এখানে চোরকে টাকা উপার্জনের জন্য অপারেশন করাবার কথা বলা হলেও তার লক্ষ্য কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ।

ওরে মানষির মুখে যাছে শুনা
যার আছে ভাই তিনটা ছাওয়া
হবার নাগে তাক অপ্রাশন।
ওরে সরকার বোলে আইন জারি করিসে এইসন।

পরিবারের অর্থ-সংগ্রহ সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয়-নীতির পরিচয় এই দুই বিষয় সম্পর্কিত সামাজিক দুই চিত্র চোর-চুন্নী এই গানটির মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই পালা গানের উপস্থাপন রীতির সঙ্গে খানিকটা

মিল রয়েছে গম্ভীরা ডুয়েট গানের। গম্ভীরাতে ডুয়েট পর্যায়ে দুটি চরিত্র দেশের সমাজের এবং নিজের পরিবারের মূল সমস্যা নিয়ে গান এবং কথোপকথন করে। চোর-চুন্নী পালা-গানে চোর-চুন্নী চরিত্র দুটি অনুরূপ ভাবে সমাজের নানা বিষয়ের সমস্যার কথা দর্শক শ্রোতাদের নিকট তুলে ধরে। 'গম্ভীরা'তে সব সমস্যার সমাধানের জন্য শিবকে জবাব দিতে হয়। চোর-চুন্নীতে সমস্যা সমাধানের কোনো কথা নেই। চোর-চুন্নী দু'জনেই সমাজের নানাবিধ সমস্যার কথা তোলে। এখানে আবার গম্ভীরার সঙ্গে একটা বিশেষ পার্থক্য।

একটি গানের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

"ওরে শুনরে ভারতবাসী
হিটা কেমন আসিলো দিন
বেংলা তাও যাছে মিটিং
আ-হা-র জলতে ভাই ভাসেছে মুরগী
ও ভাই ডাঙ্গাত ভাসে হাস
ওরে ভেরায় খাছে মাছ আর মাংস
বাঘে খাছে ঘাস,
দেখিয়া ভাই নাগেছে হাতাস
ওরে সাবধানে রাখেন দু'খান
পেটের খতিয়ান"

এর পাশাপাশি আবার মেয়েদের ফ্যাশন এই গানের বিষয় হিসেবে উঠে আসে।

কলিযুগের মেয়ের কথা কি আর বলা যায়।
আর কত ফ্যাশনের বান্ধিছে খোঁপা
আরো বান্ধেছে ফিতা
কপালেতে টিপ নাগেয়া ঠোটত দেয় আলতা
পায়ে ভাইরে পিন্দেছে জুতা।

নির্মলেন্দুবাবু রিপোর্টিং অংশটির প্রসঙ্গে বলেছেন এর সঙ্গে প্রাচীনকালের বর্ষ বিবরণীর সম্পর্ক আছে। কেন না তখন কার্তিকী অমাবস্যায় নববর্ষ হত।[৩০]

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে লোকসঙ্গীতের বর্ষবিবরণী বা রিপোর্টিং অনেকটা লোক সাংবাদিকতার কাজও করে। চোর চুরণীর এই গান সেই ভূমিকা পালন করে আসছে।

চোর-চুন্নীর ব্যক্তি জীবন রাষ্ট্র-সমাজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তি-জীবনের মূল বেদনার-কাহিনী তুলে ধরতে গিয়ে দেশের-সমাজের-চলমান পরিস্থিতির কথা বলে যাচ্ছে। আমাদের সংগৃহীত পালার এইসব রিপোর্টিং এর পর আবার চোরের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। চোর সেখানে চুরি করতে যাবার আগে চুরণীর কাছে বিদায় চাইছে।

``ওগে চুরী করিবার যামগে চুন্নী
হাসিমুখে বিদায় দে,
ওগে গলার মালা কানের সোনা
আনিম তোর বাদে।

নির্মলেন্দুবাবুর সংকলনে দেখেছি চোর বড় বাড়িতে চুরি করবার জন্য গেছে। এখানেও সেই প্রসঙ্গ দেখতে পাই—

আ-হা-র চুন্নী ধওলা বাড়ীত করিম চুরী
টাকার বাক্সো আলমারী
সন্দুকোত রাখে না মালী
আছেগে পড়ি
এ্যালা মুই যাম চোর-করি।

চোর তার স্ত্রীকে বড়লোকের বউ-এর মতো সাজ সজ্জায় সাজিয়ে তুলবে। তার এই ইচ্ছার কথা ও গানে ফুটে ওঠে।

ওগে বড়লোকের মাইয়ার মতন
শাড়ি পিন্দাম নানান মতন
ভাবিবার তোক না নাগে
ওগে গলার মালা কানের সোনা
আনিম তোর বাদে।''

কিন্তু এই চুরী করার পরিণতি যে খারাপ সে-কথাও চোর জানে। কিন্তু নিরূপায় হয়ে তাকে এই কাজ করতে হয়। চোর শেষ পর্যন্ত সে ধরাও পড়ে। ধরা পড়লে সংসার সুখের আশা শেষ হয়ে যায়।

``ওগে ধরা পরি সংসারের আশা
চুন্নী দিলো ছাড়ি,
ওকি হায় মুই কি কাম কন্নু

জান হারানু করিয়া চুরী।

পুলিশের পীড়ন সহ্য করিতে হয় — আ-হা-র দারোগা বাবু রাগ করিয়া

মোক কছে ক্যানে করলু চুরী গিয়া

মুই কছো, নাই করো মুই চুরী।

চোর মিথ্যে কথা বলে রেহাই পায় না। সেপাইরা তাকে পীড়ন করে।

ওরে এইটা কথা শুনি যেইলা

ঝাপ্পি উঠিল সিপাইগিলা

ওঠাইল পিঠের দুরদুরি

কি কাম কন্নু জান হারানু

করিয়া চুরী

আ-হা-র থানার পছিমত নিয়া যায়া

নাকে মুখে দিলেক মুতি

চিপিয়া ধরিয়া টুটি

কি কাম কন্নু জান হারানু

করিয়া চুরী।

চোরের দুর্দশা দিয়ে কাহিনী শেষ হয়। চোরের দুর্দশা দিয়ে কাহিনী এইখানে শেষ হয়। লোক কবির নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টিতে চোর চুরনীর জীবনের এই পরিণতি রচিত হয়। চোর ভেবেছিল চুরি করে সংসারের সমস্যা দূর করবে — তেমনি চুরি করে ধরা পড়ার ভয়ও তার ছিল। লোককবি এই ভাবে চোরের পরিণতি দেখিয়ে যে বার্তা দিয়ে যান তার একটা নৈতিক মূল্যও স্বীকার করতে হয়।

পাঁচালী গান বা পালাটিয়া ঃ রং পাঁচালী, খাস পাঁচালী এবং মান পাঁচালী

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার উত্তর দিকে অবস্থিত স্থানগুলিই পাঁচালী বা পালাটিয়া গানের আকর ভূমি। এই অঞ্চলের মাটিতেই পাঁচালী গান তিন রকমভাবে মানুষের কাছে সমাদৃত — খাস পাঁচালী, রং পাঁচালী এবং মান পাঁচালী। নাট্যগুণ সম্বলিত এই পালাগানগুলিকে কখনো পালাটিয়া আবার কখনো ধামগান বলা হয়ে থাকে।

শ্রদ্ধেয় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে — ''প্রান্ত উত্তরবঙ্গে 'পাঁচালি' গান বলিতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নাট্য-কাহিনীকে বুঝায়। কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র সম্বলিত নাট্য-কাহিনীকে 'পালাগান' ও বলা হয়। 'পালা'র সহিত 'টিয়া' এই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রান্ত উত্তরবঙ্গে 'পালাটিয়া' গান-ও বলা হইয়া থাকে। 'পাঁচালি' গানেরই অপর নাম পালাটিয়া গান।''[৩১]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে পালাটিয়া তিন প্রকারের হয়। খাস পাঁচালী, রং পাঁচালী এবং মান পাঁচালী। 'খাস পাঁচালী' নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে চলমান জীবনের ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনীকে নিয়ে তৈরী কোনো পাঁচালী গান। সাম্প্রতিক ঘটনা যা কোনো অনভিপ্রেত প্রেমজনিত ঘটনাও হতে পারে, অথবা সামাজিক দিক থেকে গর্হিত কোনো ঘটনাও হতে পারে খাস পাঁচালীর কাহিনী। কিন্তু রং পাঁচালী বিষয় প্রেম। প্রেমকে কেন্দ্র করে বীরত্বপূর্ণ কাজের ফিরিস্তি, কিংবা কোনো কাহিনীকে রঙ্গীন প্রেমের প্রলেপ দিয়ে তাকে মধুময় করে তোলাই রং পাঁচালীর কাজ। নির্মলেন্দুবাবু বলেছেন রঙ পাঁচালীর প্রেম কাহিনীর সবটাই কাল্পনিক। তবে প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে হাসির উপকরণ ও তাতে মেশানো থাকে।

'মান পাঁচালী' উপরোক্ত দু'ধারা থেকে ভিন্ন। তার বিষয় পুরাণ থেকে বা কোনো শাস্ত্র থেকে নেওয়া। সমাজের মান্যতা বা সম্ভ্রম রক্ষা করে এই 'মান পাঁচালী পালাগান। বীরত্বপূর্ণ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোনো শ্রদ্ধাপূর্ণ কাহিনীকে উপজীব্য করে মান পাঁচালী গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। শ্রদ্ধেয় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে — 'মান' অর্থাৎ সম্ভ্রম করিয়া, গম্ভীর্য-পূর্ণ পরিবেশে যে নাট্য কাহিনীর অভিনয় করা হয়, তাহাকেই বলে 'মান পাঁচালী'।[৩২]

পালাটিয়া দল গড়বার জন্য অনেক শিল্পীর দরকার হয়। কোথায় কোথায় দেখা গেছে কুড়ি-পঁচিশজন কোথাও আবার তিরিশ-পঁয়ত্রিশজনকে নিয়েও দল গঠিত হয়। বর্তমানে অবশ্য কম সংখ্যক শিল্পী নিয়েও এই পাঁচালী দল গঠনের চেষ্টা চলছে। দলে যিনি পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করেন তাকে বলা হয় অধিকারী বা হাদি, যিনি গান পরিবেশন করেন তাঁকে বলা হয় গীদাল বা গীতাল, যাঁরা বাজান তাঁদের বাইন এবং নৃত্য-গীত

ও নারী চরিত্রে যে সব পুরুষ অভিনয় করেন তাঁদের ছুকরী বলা হয়। এই পালা নাটকে একজন শিল্পী একাধিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। লোকসংগীত শিল্পী শ্রী পরেশ রায় এ ব্যাপারে সমীক্ষা চালিয়ে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন — ''অনেক সময়েই এক ব্যক্তি একাধিক দায়িত্ব পালন করেন। যাঁরা পালাটিয়ার নাট্যকাহিনী রচনা করেন, তাঁদের 'অস্তাদ' বা 'রস্তাদ' বলে। যে সব দলের নিজস্ব রচয়িতা থাকে না, সে সব ক্ষেত্রে সাধারণত দলের 'হাদি' বা 'অধিকারী' কোনো অস্তাদের কাছ থেকে কিছু অর্থের বিনিময়ে নাট্যকাহিনীর মূল অংশ ও গানের লিখিত রূপের খাতা সংগ্রহ করেন। এরপর মাসাধিক কাল ধরে এই পালার মহড়া চলে। পালার প্রধান পাত্র-পাত্রীর সংলাপ লিখিত থাকলেও কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো যেমন — ফকির, কোনো পথচারী, ভাঁড় (বা খিচরিয়া প্রতিবেদক), চাকর ইত্যাদি চরিত্রগুলির সংলাপ লিখিত থাকে না। এগুলো মৌখিকভাবে তাৎক্ষণিকরূপে রচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাটিয়ায় আগে ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক মেয়েই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।[৩৬]

অভিনয়-শিল্পীদের সাজ-সজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা শুধু নৃত্যশিল্পীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলি সাধারণ মেক-আপ নিয়েই অভিনয় করে থাকেন।

পাঁচালীগানের মঞ্চসজ্জা প্রচলিত নাটকের মঞ্চসজ্জার অনুরূপ নয়। পাঁচালী পালানাটকের মঞ্চটি হবে গোলাকার, ঠিক বৃত্তের মতো। অভিনয়য়ের মধ্যস্থলে বাদ্যকর এবং অভিনয়-শিল্পীগণ বসেন। অভিনেতাদের প্রবেশ বা প্রস্থানের কোনো ব্যাপার এই গানে থাকে না। তাঁরা এই অভিনয়ের আসরেই বসে থাকেন এবং প্রয়োজন অনুসারে উঠে অভিনয় করেন আবার বসে পড়েন। চরিত্রগুলি মঞ্চের মধ্যে বসে থাকা বাদ্যকারও অন্য শিল্পীদের ঘিরে ঘিরে অভিনয় করেন। চরিত্রগুলির চলাফেরার জন্য এবং অভিনয় প্রদর্শনের জন্য আসরে প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা থাকে।

নৃত্যগীত এবং অভিনয় এই তিনের সংযোগে পালাটিয়া গান উপস্থাপিত হয়। গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিবেশন করেন। আবার অভিনয় শিল্পী সংলাপ এবং গীত দুই-ই ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণ কথপোকথন সংলাপের মধ্যে দিয়ে চলে। কোনো কোনো সময় একই কথা সংলাপের মধ্যে প্রকাশ পেলেও তা আবার গানের মধ্যে ফিরে আসে। লোকনাট্যের সংগীতের একটা জিনিস দেখা যায়। লোকনাট্যের সংগীতগুলি এলাকাগত বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত হয়ে থাকে। কোচবিহারে দোতরা পালায় দোতরা গান, জলপাইগুড়িতে চোর-চুন্নীর ক্ষেত্রে চোরচুন্নী গান, বিষহরিতে বিষহরা গান — অনুরূপভাবে পাঁচালী বা পালাটিয়ার পালাটিয়া গান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দার্জিলিং-এর নিম্নসমতলভূমি এলাকায়, তরাই অঞ্চলে লাহাংকারী গান। এই অঞ্চলের পালাটিয়া গানে ব্যবহৃত হয়। এ নাটকে লাহাংকারী গানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

লাহাংকারী গানের সুর মূলত লৌকিক এবং প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষা নিরপেক্ষ এবং সহজাত। লাহাংকারী গানে যে সুর কাঠামো ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ — সা, রা, মা, পা, ধা, না, সা, রা, সা, না, ধা, পা, মা, জ্ঞা, রা, সা, না, না, সা, জ্ঞা, রা, সা। এই সুর কাঠামো না ভীমপলশ্রী না দরকারী কানাড়া অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট রাগের সুর কাঠামো দিয়ে বাঁধা যায় না এবং এখানেই এই লাহাংকারী গানের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত হিসাগে গণ্য হওয়ার মতো মূল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।"[৩৪]

কোনো শিল্পী একটি সংলাপ হয়তো গানের আকারে বলছেন। তখন কিছু থাকে বলা হচ্ছে তিনিও সে গানে গলা মেলাবেন। বক্ত এবং শ্রোতা দুজনেই এই গান পেয়ে থাকেন। গানগুলির সঙ্গে সরলভাব দর্শক শ্রোতার মনকে সুখে দুঃখে ভরিয়ে তোলে। লাহাংকারী গানে সুরের বৈচিত্র্য আছে। ভাসানী সুর, ঢিপানী সুর, উদাসী সুর এবং পাথারী সুর — এরূপ বিভিন্ন সুরে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভাসানী সুরে ভাওয়াইয়ার দরিয়া বা দীঘলনাসার সুরের মতো দীর্ঘ শাসাঘাতের ভেতর দিয়ে এই গান পরিবেশিত হয়। ঢিপানীসুরে থাকবে চলন্তী বা চটকা গানের সুর। মনোশিক্ষা বা তুক্খ্যা গানের সুরে যেমন উদাস সুর থাকে ঠিক তেমনি লাহাংকারী গানে কখনো কখনো উদাস সুরের ব্যবহার হয়ে থাকে। বৈরাগ্য বোঝাতে বা ভাবজগতের মোহবন্ধন কাটিয়ে ওঠার যে গানগুলি রচিত হয়ে থাকে সেই গানগুলি উদাসী সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। পালাটিয়া লোকনাটকে বিশেষ করে স্ত্রী চরিত্রের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা 'পাথারী' সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

পাঁচালী গানের তিনটি ধারাতে আসর বন্দনা একইরকম ভাবে হয়। আসর বন্দনার পর কলাকুশলীরা এক এক করে আসরে এসে বসেন। এরপর যাত্রার ঢং-এ শুরু হয় কনসার্ট। কনসার্টের পর নৃত্য শিল্পীরা দুটি বা তিনটি নাচ দেখিয়ে যান। দর্শকদের অভিনয়মুখী করে তোলার জন্য এবং তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য এরকম নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। চরিত্রগুলি অভিনয়ের জন্য দৃশ্য-অনুসারে আসরে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দেয়। এই পরিচিতি পর্বের ঢং অন্য পালা নাটকগুলেতে দেখা যায় না।

রং পাঁচালী গানের বন্দনার একটি অংশ —

পয়ার হরি তোর নামের মহিমা যত
বন্দি হরি তোর শ্রীপাদ পদ্ম
হরি কোন নামে তোর করি বন্দনা
দয়াল হরিহে পুরাও হরি
মোর মনের বাসনা

চিতান এবার দাও হে হরি তোমার রাঙা চরণ
মস্তকে করিব ধারণ
আমার লাজ লৈজ্জা কর নিবারণ
খোসা হরি অধমজনায় আমি
কিছুই জানি না
কেমনে করিব হরি
তোমার সাধনা

অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক যে বন্দনা গানটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে নানা দেবের বন্দনা করা হয়েছে।

দেব সত্যযুগের নারায়ণ শিব
তৃতীয়াতে রাম
দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।[৩৭]

খাস পাঁচালি গানের চিন্তাশোরী পালার যে বন্দনা শিশির কুমার মজুমদারের বইতে পাই তা নিম্নরূপ —

ও মা দেখ কলির ব্যবহার
পাপে ডুবিল সংসার
ও মা জলপাইগুড়ি ডুবিল জলে
দেখিয়া মন কান্দে সবাকার।[৩৮]

এই পাঁচালী গান কারো বাড়িতে বা কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণমূলক ভাবে সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ভাবে কোথাও উৎসাহী ব্যবস্থাপকদের দ্বারা চাঁদা উঠিয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমানায় কিছু দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

যে স্থানে পালাটিয়া গানের অনুষ্ঠান হয় সেই স্থানটিকে লোকায়ত ভাষায় 'ধাম' বলা হয়। এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দুবাবুর অভিমত কিঞ্চিৎ ভিন্ন তিনি বলেছেন "বিশেষ বিশেষ উৎসবে অথবা কয়েকটি গ্রামের নাট্য দলের অভিনয় প্রতিভার উৎকর্ষ বিচারের উদ্দেশে এক বা একাধিক রাত্রিব্যাপী যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হইয়া থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় তাহাকে বলে ধাম।"[৩৯] ধাম এই শব্দটি তীর্থস্থানের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বহুলোক সমবেত হয় বলে সেই স্থানটি তীর্থক্ষেত্র বা ধামরূপে বিবেচিত হয়। এই ধামগানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের বিশেষ অর্থ দেওয়া হতো না। এই গানে অংশগ্রহণকারীরা বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুসারে পুরস্কৃত হন। ধামের আর একটি বৈশিষ্ট্য সেই স্থানটিতে অবশ্যই কালাঠাকুর

বা রাধাকৃষ্ণের থান বা মন্দির থাকবে।

লোভী জোতদার লোকনাটকের পর্যালোচনা ঃ

লোভী জোতদার 'খাস পাঁচ'লী' পর্যায়ের একটি লোকনাটক। লোভী জোতদারের পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি— এর ফলে যে একটি লজ্জাকর ঘটনা ঘটে তাই এর বিষয়। এই লোকনাটকের মঞ্চ-সজ্জার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। পাল্লার কুশী-লবগণ আসরে যাওয়ার আগে সাজঘরে কিছু নিয়ম পালন করেন। তন্ত্র-মন্ত্র জানা ব্যক্তি জলের মধ্যে মন্ত্র পড়েন। সেই জল সবার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আসরে পালানাটক সফল করার জন্য কায়-মনোবাক্যে দেব-দেবীর কাছে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা প্রার্থনা করেন। দুটি বা তার বেশী দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হলে তন্ত্র-মন্ত্রের বা 'বাণ' মারার বিষয়টি এসে যায়। এই লোক-বিশ্বাসটি মনে বহুদিন ধরেই আছে। কোনো কোনো দলে দেখা যায় জলের বদলে 'গজমারা' (তেলীর বাড়ির তেল) তেল হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়ে —

মোহিনী মোহিনী রস মোহিনী
মুখের রস গৌরী দেবী দিলে যশ
কামরূপী ডুকুরিয়া মোক ফল্লাকে করেন দয়া
তিপ'থি ঘাটার মাটি শামসুন্দর নাম
খাট পালঙ্গ বসিবারে পাং
সিংহরূপী সোন্দানুং
বাঘরূপে বিরানুং
কাঁও কোনো না বলিবে মোক।
আয় মা শুভচনি।
মোক কোলাত ধরি বৈস।
মোর ফল্লার হয়্যা দুইটা কথা কৈস।
এই মন্ত্র হেলিবু পেলেবু
কালিক' চণ্ডীর মাথাত
দুই পা বুছিবু।

এই মন্ত্র পড়া শেষ হলে বাদ্যযন্ত্রের শিল্পীরা আসরে প্রবেশ করেন। দলনেতা বা মূল গায়ক মাটিতে প্রণাম করে শিল্পীদের সঙ্গে বসেন। বাজানদাররা প্রথমে একটি কনসার্ট করেন। লোকায়ত ভাষায় 'হাড়ুড়া দেওয়া' বলে। এই বাজনার সঙ্গে নর্তকীরা চারদিক ঘুরে নৃত্য শুরু করেন। নৃত্য শেষ হলে 'বন্দনা' শুরু হয়। 'খাস পাঁচালী' 'রং

পাঁচালী' এবং 'মান পাঁচালীতে বন্দনা একই রকম। কাহিনীর উপস্থাপনাও এক। নাটকের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে এই পার্থক্য। রং পাঁচালী গানের একটি 'বন্দনা' আগেই আমরা দেখিয়েছি। মান পাঁচালী 'দস্যু কন্যা কালিন্দী' পালা নাটকের 'বন্দনা' উল্লেখ করা যেতে পারে —

'তোমায় ডাকি হে ওহে দেব নারায়ণ
এসো এসো দেব পঞ্চানন।
আমি সংকটে পড়িয়া ডাকিহে
দেব নিজ জ্ঞানে কর পার
তুমি দীনের বান্ধব হে ওহে চিনি না তোমায়
আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি নাগো দেব
এসোগো আনন্দেরও নন্দন
তুমি দীনের বান্ধব হে ওহে ভলা মহেশ্বর।'

'বন্দনা' শেষে পাঁচালী বা পালাটিয়া লোকনাটকের চরিত্ররা এক এক করে নিজের পরিচয় দেন। এই চরিত্র-পরিচয় পঠটি সোজাসুজি করে দেখানো হয় না। পরস্পর সংলাপের মধ্যে পরিচিতি পর্ব শুরু হয়। 'লোভী জোতদার' লোকনাটকটি এইভাবে শুরু।

জোতদার — নমস্কার। মোর নামড়া বাগে লোভী জোতদার। আর এই ডাবা (দুলালীক দেখায়) মোর বেটি, তোর নামটা কহ বেটি।

দুলালী — তে বাবা তুইহে কয়হা দেনা তে মোর নামডা।

জোতদার — নাহায় বেটি নাহায়, এইঠে নিজের নামডা নিজে কহবা লাগে।

দুলালী — তে বা মোর নামডা দুলালী।

এর কিছু পরে মোড়ল প্রবেশ করেন। জোতদারের সঙ্গে কিছু কথা হয়। তারপর নিজে বলেন —

— বাবুগে নমস্কার। মোর নামডা ল্যাঠালাগা....। পরিচয়ের সঙ্গে নিজের চরিত্রের প্রকাশ পায়।

প্রথম দৃশ্যে জোতদার মোড়লকে তার দুঃখের কথা বলেন। পত্নী-বিয়োগ ব্যাথায় তাঁর মনে খুব কষ্ট। সংসারে স্ত্রী লোক না থাকায় তাঁর এবং তাঁর মেয়ে দুলালীর খুব কষ্ট। মোড়লকে জানান —

— তে বুঝিলো মড়ল, তুইত ভাই তামানে জানিস, আজি তোর ভোজি মরিবার বার-তের বছর হয়া গেল্। আজি আরহ নায়া করিয়া ফম পড়েচে। ঠিকভাবে জোতদারীতে তাঁর মন নেই। দয়াল সিং প্রজার বাড়িতে যেতে মোড়লকে যেতে বলেন। খাজনা বাকী পড়ে রয়েছে। দয়াল সিং-এর স্ত্রী চালাকিশ্বরী। নামের মধ্যেই বোঝা যায়

চালাকিশ্বরী চতুর বুদ্ধিমতী মহিলা। ঘরে তাঁদের একটি ছেলে। শক্ত সিং। অলস প্রকৃতির মানুষ। অর্থ-উপার্জনে এখনো সক্ষম হয়নি। তবু সে বিয়ে করতে চায়।

মোড়ল দয়াল সিং-এর বাড়িতে পাওনা টাকা বা ধানের জন্য চাপ দিতে গেলে দয়াল সিং-এর বৌ চালাকিশ্বরী বলেন —

'তমহা গরীপের দয়া মায়া দেখন নারে, হামাযে কেনং করি দিন কাটেচি, ঐডাত তমহা কি বুঝিবন। চলদি মহ তোর সগত গিরি ঘর যাম। পঞ্চম দৃশে চালাকিশ্বরী জোতদারের বাড়িতে এসে নমস্কার করেন ''গিরিদা, আর কি কোহাম, হামার অবস্থাত দেখায় পাতিত। আজি মড়লডা যায়া বাহেচার ধানলা মুই পিসাই ঘর তকা আনিনু। ঐলা ধান জোর করি লিয়া আসিল।

চালাকিশ্বরীকে দেখে জোতদারের মতলব তৈরী হয় — তাকে কীভাবে ফুসলিয়ে ঘরে আনা যায়। চালাকিশ্বরীর বুদ্ধি দেখে প্রশংসা করে তাঁর স্বামী দয়াল সিং। জোতদার মোড়লকে দিয়ে চালাকিশ্বরীর কাছে কু-প্রস্তাব দেয়। মোড়লের কথায় চালাকিশ্বরী রেগে বলেন — তমহার করজ খাচি বাদে কি তমহা যেই কভেন হামা সেইখানি লিমরে। তুই এলহায় নিকিলা। মোর মহল একা না হলে মুই তোক ঘাড় ধাক্কা দিয়া নিকিলায় দিম এলহায়। হারামজাদা লুচ্চা কুত্তেকার।''

মোড়ল অপমানিত হয়ে ফিরলে জোতদার চালাকিশ্বরীর পরিবারকে জব্দ করার 'ফন্দী আঁটেন। টাকা-পয়সা সহ গয়নার বাক্স দারাসিংকে দিয়ে চুপিসারে দয়াল সিং-এর বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন। দয়াল সিংকে চোর-অপবাদ দিয়ে চালাকিশ্বরীকে চরম শাস্তি দেবেন।

মোড়ল থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে বলেন জোতদারের বাড়ীতে চুরি হয়ে যাওয়ার কথা। দারোগাবাবুদের সঙ্গে জোতদারের সম্পর্ক ভালো। এই সংবাদে তিনি উদ্বিগ্ন। গ্রামের জোতদারদের সঙ্গে পুলিশ-প্রসাসনের সম্পর্ক ভালো। জোতদাররা পুলিশদের সঙ্গে স্বার্থ রক্ষার জন্য সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। এই নাটকে অন্তত, তা দেখানো হয়েছে।

দারোগা — কি চুরি। জোতদার বাবুর বাড়িতে। চলো চলো কনস্টেবল, ঘর বন্ধ করে আমার সঙ্গে চলো।

দারোগাবাবু জোতদারের বাড়ীতে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন — ''আচ্ছা, আচ্ছা তাহলে তো অনেক টাকার মাল নিয়ে গেছে। আচ্ছা জোতদারবাবু, আপনার কি কারো ওপরে সন্দেহ হয় ?

জোতদার — ''তাকে সেটা হচ্ছে আমারই এক প্রজা দয়াল সিং। আপনি এখনি যান হয়তো মালপত্র তার বাড়িতেই পেতে পারেন।''

লক্ষ করা যায়, দারোগাবাবু এবং জোতদারের সংলাপে চলতি বাংলা ভাষা। এই জোতদারই তাঁর গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন সেখানকার আঞ্চলিক ভাষায়। এই লোকনাটকে গীত আছে কিন্তু নাটকটি গীতাত্মক নয়। গদ্য সংলাপই এখানে মুখ্য। বিভিন্ন দৃশের ভাগ আছে। চরিত্রগুলির প্রবেশ প্রস্থান আছে। দোতরা, কুশান বা বিষহরি পালার মতো এই নাকি গীতাত্মক নয়।

বাড়িতে চালাকিশ্বরী এবং দয়াল সিং গয়নার বাক্স দেখেন। কোনো কিছু ধারণা করার আগেই দারোগা বাড়িতে হানা দেয়। জোর করে দয়াল সিংকে থানায় নিয়ে যান। চালাকিশ্বরীর বুঝতে দেরী হয়না — এই ঘটনার পেছনে কার ফন্দী। দুঃখে গান গেয়ে ওঠেন —

"ও কি ওরে প্রাণ সওয়ামী নিদয়া হয়া তুই যাবো।
ওরে সাধের আড়ি তুই মোক করিলো।
আজি যদি নারী হোম মুই সতী
তব পদে রাখিম ভকতি।
ঐ চরণে পাবো গতি।"

চালাকিশ্বরী স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেন — 'যা ভাই যা, মুই তামান বুঝা পাইচু, এইলা তামানলায় শয়তানের চক্রান্ত। মুই যে কুনো বারকারে হোক তোক তাড়াতাড়ি ছুটাই আনিবার ব্যবস্থা করিম। 'শাস্তরী' পালার 'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোসাই লোকনাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকা আমরা দেখেছি। যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজের মত স্থাপন করেছেন জ্ঞানবালা। 'লোভী জোতদার' লোকনাটকে চালাকিশ্বরীর বুদ্ধি ও সাহস লক্ষ করার মতো। জোতদারের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দেন এই গ্রামের নারীটি — 'হায় ভগবান, এইলা কি পাকত ফেলালো। ঠিক ছে রে জোতদার, তুই মোর পাছত লাগিচিস। মহ দেখিক তুই কতদূর।"

চালাকিশ্বরী জোতদারকে তাঁর বাড়িতে আসতে বলেন। জোতদারের মন গলানোর জন্য চালাকিশ্বরী গান করেন—

"গিরিদাদারেহে, শুনেক মোর মনের কাথা
হা ওরে তোর উপর বড়য় করিচু আশা।
[illegible] হাতত নাই মোর হাতের চুড়িহি।
গলার মালা কানের সোনা।
আজি তুই বিনা মোর কায় আর আছেরে আপনজনা।

চালাকিশ্বরীর কথামতো জোতদার সবরকম গয়না দিতে সম্মত হন। চালাকিশ্বরীর পরিকল্পনা নিজস্ব। শক্ত সিং তাঁর ছেলে। ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে জোতদারের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। শক্ত সিংকে এই মিথ্যা অভিনয়

করতে হবে। এতে তারই বিয়ের ইচ্ছা পূরণ হবে। চালাকিশ্বরীর পরিকল্পনা ছেলে রাজী হয়ে যায়। নতুন বৌ সেজে শক্ত সিং কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। মোড়ল সোজা তাকে নিয়ে জোতদারের বাড়ীতে পৌঁছে যান। শক্ত সিং জোতদারের মেয়ে দুলালীর হাত দিয়ে সমস্ত সোনার অলংকার পড়িয়ে নেয়। অবশেষে জোতদার বুঝতে পারেন চালাকিশ্বরীর ছলনা জোতদার চীৎকার করে বলেন — কি বাউ, তুই যদি ভাল জানিস তে এহঠে তত করা চলিয়া যা না হলে মুই তক পুলিশের হাতত দিয়া দিম।'

শক্ত সিং — ''যাম যাম, মুইত রভার বাদে আসিনু, তবে মোর গালাত যায় মালাখান দিসে তাক মোর সঙ্গে দিয় দিলই মুই চলি যাসু।''

জোতদারের মেয়ে দুলালীকেই শক্ত সিং নিয়ে যেতে চায়। চরম অবস্থার মধ্যে পড়ে জোতদার পঞ্চায়েত প্রধানকে ডেকে আনেন। খাস পাঁচালী কারো কলংকের বিষয় নিয়েই রচিত হয়ে থাকে। যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। পঞ্চায়েত প্রধান এসে শক্ত সিং-এর কাছে সব ঘটনা শোনেন। তিনি দুলালীর সঙ্গে শক্ত সিং-এর বিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। চালাকিশ্বরীর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার উপদেশ দেন। এতে জোতদারের নোংরা পরিকল্পনার কথা অনেকটা চাপা পড়ে যাবে। বে-কায়দায় পড়ে জোতদার সবই মেনে নেন। শক্ত সিং-এর সঙ্গে দুলালীর বিয়ের দিন নির্দিষ্ট হয়। চালাকিশ্বরী বলেন — 'দেখিলো বাবু মুই কোহোনু না, মোর বুদ্ধি ধরলে তোক বহু বোসর দিম।'

শক্ত — হ্যা আঈ, ছাচায়, ঐতানে তোর নাম থুইচে তোর বাপটা চালাকি। তোর লাকা বেটি ছুয়া হোলেত কুন চিন্তায় নাই। চল আঈ, মড়ল কাকাড়া থানা যাবে হামাও যাই।'

মায়ে-ছেলে বেশ মজা করে এখানে অভিনয় করেন। শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চলের লোকভাষার ব্যবহার এখানে লক্ষিত। পুরো নাটকটিতে চালাকিশ্বরীর বুদ্ধির প্রকাশ। দয়াল সিংকে মোড়ল থানা থেকে নিয়ে আসেন। দয়াল সিং এখন জোতদারের বেয়াই মশায়। জোতদারের এই কলংক মেয়ে দুলালীর মনে কষ্ট দেয়। দুলালীও ভাবে নি এরকম ভাবে শক্ত সিংকে বিয়ে করতে হবে। আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান গায় —

বাবা এতয় দুঃখ দিলেনগে অন্তরে
হিবড় কেলেংকার রাখিলেন গে সংসারে।
বাবা লাইক্ষ লাইক্ষ জুড়ি মেলে
লাইক্ষর উপর পদীপ জ্বলে
বাবা গো, সুখ শান্তি মোর হোবে কুন্ কালে।'

জোতদার মেয়েকে সান্ত্বনা দেন। এবং বুঝিয়ে বলেন — 'তুই স্বামী পালো, শ্বশুর-শাশুড়ি পালো, তোর কিসের অসুবিধা মা, তুই এলা স্বামী-সংসার লিয়া সুখে খা।'

ঘরবাড়ী-সম্পত্তি মেয়ে-মেয়ে-জামাইকে দিয়ে জোতদার তীর্থ করতে বেরিয়ে যান। তিনি কলংক নিয়ে থাকতে চান না। জোতদারের মনের ব্যাথাই নাটকের শেষে বেশী করে ফোটে। মূল গায়কের কণ্ঠস্বরে গান শোনা যায়—

'মিলন হইলোরে শুন দশজন,
ওরে লোভের কারণে শাস্তি দিলোরে নারায়ণ।'

চরিত্রই জোতদারের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার জন্য জোতদার শাস্তি পেলেন। লোকনাটকটিতে নীতি শিক্ষার দিকটিকেও দেখানো হয়েছে।

বিষহরা বা বিষহরি

বিষহরি পালা উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য। উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) আসামের নিম্ন অঞ্চল কাছাড় ত্রিপুরা ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলা এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে বিষহরা বা বিষহরি গান প্রচলিত আছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বিষহরি মনসার পূজার প্রচলন যথেষ্ট। কোনো উৎসবের পূর্বে বিশেষ করে বিয়ের উপলক্ষে মনসা পূজা করতেই হয়। এই উপলক্ষে বিষহরির গানের অনুষ্ঠানও করা হয়। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন ধরে এই গান চলে। কোনো কোনো সময় আবার মনস্কামনা পূরণের ইচ্ছা, বা পূরণ হবার ফলে বিষহরির পূজা করা হয়ে থাকে। এভাবে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজের সঙ্গে দেবী মনসার পূজার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হতে দেখা যায়। মনসা পূজার এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বলা যেতে পারে লোকসমাজের সঙ্গে মনসা দেবীর এই যোগ বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বিষহরি পালা গানের আগে মনসার পূজা করা হয়। যে বাড়িতে পূজা হয় তার মালিককে বলা হয় মারেয়া। যে মারেয়ার বাড়িতে এই পূজা হয় তার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে পূজা কীরকম হবে — কতদিন গান হবে। সামর্থ্য থাকলে মূর্তিপূজা এবং তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত গান হতে পারে — নতুবা শুধু ঘটপূজা করে একদিনেই জাগানি ভাসানি করা হয়। জাগানি ভাসানি কথার অর্থ জাগরণ এবং ভাসান বা বিসর্জন। গানের অনুষ্ঠানের পূর্বে মারেয়া মূল গীদালের সহযোগিতায় মনসার ঘটস্থাপন করে পূজা করেন। গানের অনুষ্ঠানের সময় এই ঘট বসানো থাকে। গানের মধ্য দিয়ে কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা প্রতিষ্ঠা হয়। চাঁদের বিরোধিতা বেহুলার স্বর্গে গিয়ে লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি কাহিনীর শেষে মনসার পূজার কথা আসে। পূজার সময় কলা, হাঁসের ডিম আতপ চাল উপচার হিসেবে দেওয়া হয়। তখন আবার মনসার পূজা করা হয়। মনসা পূজার সঙ্গে স্থানীয় নদীগুলিকেও পূজা করা হয়। নদীর পূজার সঙ্গে মনসা পূজার এই সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বল যায় না। মনে হয় এখানে মনসাকে নদীর দেবী বা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে অর্চনা করা হয়। প্রাচীন কালে জলের অধিষ্ঠাতারূপে নাগ পূজা প্রচলিত ছিল। সম্ভবত জলের অধিদেবতা রূপেই মথুরা অঞ্চলের দীঘি মধ্যে এইসব নাগমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হত। বিষহরি পূজার সঙ্গে নদীর পূজার এই রকম সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

নদ-নদীর বন্দনা অংশ —

যেমন — "মহানন্দা নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া
বালাসন নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া
ব্রহ্মপুত্র নদ বাপু পূজা নেও আসিয়া
করোতোরা নদী মা তুই পূজা নেও আসিয়া

যত নদীর নাম জানি বা না জানি
সহস্রকোটি নদী তোমরা বস সারি সারি।
থান হতে উঠে আয় থানের থানশ্রী
রাজ্য হতে চলে আয় রাজ্যের তিস্তা বুড়ি
ময়না বিষহরি মা তুই পূজা নেও আসিয়া
মায়েয়ায় পূজে তোমার একান্ত করিয়া

এই পালানাটকে অংগ্রহণকারী শিল্পীগণের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। মূল ধুতি-চাদর-শার্টের ব্যবহার করেন। গীদালের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রী যাঁরা থাকেন তাঁরাও পরিচ্ছন্ন সাধারণ পোষাক ব্যবহার করেন। গীদালের মুখোমুখি দোয়ার বা বৈরাগীর পোষাকও অতি সাধারণ। দোয়ারির পোষাক এমন হয় যাতে সহজে লোকের চোখে পড়ে। গীদালের হাতে থাকে চামর। দোয়ারের মুখে সামান্য মেক আপ থাকে। মেক-আপ বেশী মাত্রায় থাকবে নর্তকীদের সাজ-সজ্জায়। পুরুষরাই সাধারণত মেয়ে সাজে বলে যতরকম ভাবে মেয়ে ভাব ফুটিয়ে তোলা যায় সেই চেষ্টা করা হয়। এই নর্তকীদের সবাইকে যুবতীর উগ্র সাজে সজ্জিত হতে হয়। পরচুলা, মেক-আপের সাধারণ দ্রব্য, রঙীন শাড়ি, আলতা-লিপস্টিক, কাজল তাঁদেরকে প্রসাধনের জন্য ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে কোনো কোনো দলে মেয়েদেরও নর্তকীর ভূমিকায় পাওয়া যাচ্ছে। পূজা-পার্বণে বা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিষহরি পালাগানের দলও কোথাও কোথাও দেখা যায়। বর্তমানে বিষহরা পালাগানে আধুনিক যাত্রার প্রভাব আসার জন্য চরিত্রানুযায়ী সাজ-সজ্জা আবশ্যিক হয়ে উঠছে। এই পালানাটকগুলি সরকারী বা বেসরকারী অনুষ্ঠানের ফরমায়েশ মতো পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবু বলা প্রয়োজন প্রচলিত ধারা গ্রাম-জীবনে প্রবাহমান। সাধারণ বাঁশি সব নাটক-যাত্রা-পালাতেই চলে কিন্তু, 'মুখা বাঁশি' বিষহরি পালাগানে অপরিহার্য। এই মুখাবাঁশি' এই অঞ্চলেই তৈরী হয়। খোল, করতাল, মুখা বাঁশি — এই তিনটিই এই লোকনাট্যের প্রধান বাদ্য যন্ত্র। ড. সুখবিলাস বর্মার মতে — "এই গানে সর্পদেবী মনসার পূজার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিশেষ সহায়ক যন্ত্র মুখবাঁশি ব্যবহৃত হয়। মুখাবাঁশির মুখটা গোল বড় ধরনের। বাজানোর সময়ে সারা মুখ ভরে যায়। এর বাদনভঙ্গি এমন যে বাদক বাঁশিটি মুখে রেখেই মুখের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস (দম) ঘুরিয়ে নিতে পারে — ফলে বাদনকালে বাঁশির সুরে ছেদ পড়ে না। একজোড়া মুখবাঁশি এভাবে সাপ খেলানোর সুর সৃষ্টি করে।"[৩৮]

মুখাবাঁশিতে যে সুর সৃষ্টি হয় তাকে সুখবিলাসবাবু 'সাপখেলানো সুর' বলেছেন এই সাপখেলানো সুরই বিষহরি গানের মূল সুর। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এই সুরের অনুষঙ্গী। সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের সুরে একটা বিশেষ আবহ তৈরি হয়। যাতে পালা গানের বিষয় সম্বন্ধে অবহিত না হয়েও যে 'বিষহরি পালা' অভিনীত হচ্ছে তা কেবল এই সুর

থেকেই বোঝা যায়।

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের মূল শিল্পী গীদাল। যে কোনো লোকনাট্যেই তার ভূমিকা মুখ্য। তিনিই কাহিনী উপস্থাপনা করেন। কাহিনীর সংযোজনা করেন। চরিত্রগুলি কথা তিনি জুড়ে দেন। গানের সুরে প্রধানত তাঁর উপস্থাপনা চলে। তাঁর গানের মাঝে মাঝে পাই অন্যান্যদের সংলাপ। কিন্তু তাঁর গানে গল্পের ধারাবাহিক বিন্যাস থেকেই যায়। আমরা অন্য একটি লোকনাট্যের আলোচনাসূত্রে বলেছি গীদাল পালা সংযোজনা করেন গানে গানে - আর চরিত্রগুলি তাদের কথা বলে এর ফাঁকে ফাঁকে - গদ্য বা পদ্যে বা গানে। বিষহরি বা বিষহরাকেও সেই রীতি। বিষহরা পালা গানেও মঞ্চ সজ্জার কোনো পরিপাটি বন্দোবস্ত থাকে না। অন্যান্য নাট্যে মঞ্চ ব্যবস্থার মতো এখানেও একই ভাবে লোকনাট্যের মঞ্চ সজ্জা হয়। গীদালের সঙ্গে থাকে দোহার বাদক ও অভিনেতা রূপে পাঁচ ছয়জন সহযোগী। তাছাড়া নাচের জন্য পাঁচ ছয় জনের একটি দল থাকে। তারা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বা ঘুরে ঘুরে বাজনার তালে নাচগান করে। গীদালই পালার মূল গায়ক দোহার তার সঙ্গী বা অনুসরণকারী গীদালের হাতে থাকে চামর। এই পালানাটকের মঞ্চের চারদিকে থাকে দর্শকের আসন। গীদালই গান ধরেন। দোয়ারি তার গানের ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি চলে কথোপকথন। মাঝে মাঝে নাট্য প্রসঙ্গ বহির্ভুত বিষয় এনেও হাস্যরসের যোগান দেওয়া হয়।

এরপর আসে নেতা মনসার কথা সেও গানের রূপে

মনসার কথা — তবে কি বুদ্ধি করিব দিদি পাত্র নেতাই।
(গীদালের গানে) কেমনে বানিয়ার হস্তে ফুল জল পাই।।
ধনে জনে দৌদ্দ ডিংগা ডুবাইলাম সাগরে।
তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ পূজা নাহি করে।
মস্তক মুড়াইয়া সাধুর করিল'ম যন্ত্রণা।
তত্রাচ না পূজে সাধু কি করি মন্ত্রনা।।
ছয় পুত্র মারে সাধুর মূলে করিলাম হানি।
তত্রাচ বিবাদিয়া চাঁদ না দেয় ফুল পানি।

এইভাবে পালার সূচনা। লক্ষণীয় পালা আরম্ভ হয়েছে চাঁদের মনসার পূজা না করার কথা দিয়ে। মনসামঙ্গলের মত এখানে প্রথম থেকেই মনসা ও চাঁদের বৃত্তান্ত দেখানো হচ্ছে না। কবি বা লোকগীতের রূপকার সারাকারি চাঁদ মনসার দ্বন্দ্বের কথা তুলেছেন। পদ্মাবতী নেতোর কাছে পরামর্শ চাইছেন কীভাবে চাঁদের পূজা তিনিনি পাবেন। লক্ষণীয় পদ্মাবতীর সংলাপ হচ্ছে গদ্যে —

পদ্মা ওগো দিদি আমি এই চম্পালা পুরীর চাঁদ বানিয়ার হস্তে কি বুদ্ধে পূজা পাব দিদি ?

নেতা উত্তর দিচ্ছেন পদ্যে বা গানে। এ গান গাইছেন মূল গীদাল

নেতা বলে পদ্মাপতি আমাক কর সুত।
অষ্টনা প্রহর তোকে জোগাইয়া দেহ বুধ।।
আমার বচনে পদ্মা শীঘ্র করে যাও।
ধনমতরি রূপে যাও চাম্পালানগর।।
উনিইন্দ্র ঊষা কন্যা আন ইন্দ্রের ঠাঁই।
সনকার গর্ভে দেও দুল্যপ লখাই।।
মেনকার গর্ভে দেও বেহুলা সুন্দরী।
তবে হলে সাধিবা বাদ শুন বিষহরি।।
নেতার বচনে পদ্মা সেই কর্ম করে।
ধনমতরি রূপে গেল চম্পালানগরে।।
পদ্মা নগরে গিয়ে নাগরিকদের বর দিতে চাইলেন
বরণেও হে নগরীয়া লোক বর নেওহে শুনি।
চাঁদের গৃহিনী সোন যেত আইল শুনি।।
(অনিরুদ্ধ লোক উচ্চারণে 'উনি ইন্দ্র')

সনকা জিগ্যেস করে এই দেব সেবিলে পার কোন বর দান ? ধন্বন্তরি রূপী পদ্মা উত্তর দেয়। আন্ধেলা পাবে আঁখি দান, হাপুত্রে পাবে পুত।' সনকা বর নেয়। ধন্বন্তরি বলে দেয় —

সনা পুত্র বর নেও
মনসা সুন্দরী আগে ফুলজল দাও
না করিবে মনসার পূজা মা তোমার স্বামী
মনের অভিমানে।
কিন্তু বিবাহ রাত্রিতে পুত্রকে তোমার রাখিবে সাবধানে।।

এইবাবে লক্ষ্মীন্দরের জন্ম কথা দিয়ে এই পালার শুরু হয়। সব সময় যে এই একই রকমভাবে পালা শুরু হবে তা নয়। কোচবিহারের অন্য একটি লোকনাট্য বিষহরি পালায় নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে অনেকটা dramatic effect তৈরির কথা মনে রেখে। সেখানে চাঁদের মুখে মনসার ক্ষতিকর ভূমিকার কথা বলে পালা শুরু করা হয়েছে।

শয়তানী পদ্মাবতী কত হানি করে।

ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙা ডুবাইছে সাগরে।।...

তখন পদ্মার দৈববানী

শোন শোনেক চাঁদ এলাও কং মোর পূজা কর।

ধনে জনে ভরিয়া উঠবে তোর সব ঘর।।

এইভাবে প্রথমেই মনসা ও চাঁদের দ্বন্দকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। আমাদের সংগৃহীত পালা অনেক বেশি সঙ্গীতাত্মক, নাটকীয়তা সৃষ্টি তাতে কম। কবিরা এতদঞ্চলে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যের লৌকিক রূপের গীতাত্মক উপস্থাপনা করেছেন। আমাদের সংগৃহীত পালার সনকা মনসার কাছে বর নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ওদিকে মনসা স্বর্গে গিয়ে ঊষা অনিরুদ্ধকে অভিশপ্ত করে মর্তে আনলেন। ইন্দ্র বলে,অবগতি কেন আইলি শীঘ্রগতি হেথায় তোমার কিবা প্রয়োজন (পদ্মা বলে) মর্তদেশে এক চাঁদ সদাগর আছে। তাহার হস্তে পূজার হইল সাধ উনিইন্দ্র ঊষা যাবে। পুত্রবধূ করাবে তারে। তবে আমি সাধিতে পারি বাদ।

মনসার কথায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন — তারা নাই করে দোষ

কেমনে করিব রোষ

কেমনে পাঠাব মর্তাভুবন ?

তবু ইন্দ্রকে ছেড়ে দিতে হয়। ঊষা অনিরুদ্ধকে মনসা অভিশপ্ত করে আনেন। লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার জন্ম হয়। এই গানে মূল গীদাল প্রায় একক ভূমিকায় কাহিনীর গীতাত্মক উপস্থাপনা করে যান।

এইভাবে মনসা মঙ্গলের কাহিনীর আদলে বিষহরা পালায় একের পর এক ঘটনার উপস্থাপনা হয়। লক্ষ্মীন্দরের বয়স হল, কিন্তু বিয়ে হল না। মনসা কৌশল্যার মূর্তি ধরে লক্ষ্মীন্দরকে স্বপ্ন দেখায় - স্বপ্নে বালার সঙ্গে রতি করে মহারঙ্গে। কৌশল্যা লক্ষ্মীন্দরের মামি, মনসার ছলনায় তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের ফলে কৌশল্যা অভিশাপ দেয় —

অব মররে নিবংশের বেটা,

কন্ধ তোর যাক কাটা। দংশিবে তোক পদ্মার নাগিনী।

পদ্য গীত ময় সংলাপের মধ্য দিয়ে অভিযোগ করে কৌশল্যা

ওকি ওগে ননদদিদিবাই, কুলগেল ভাগিনার হাতে

হে মোর দিদি গেলাম আমি ভাই সরোবরে

কলস ভাঙিল বলে উদর ভাই করিল লণ্ডভণ্ড ...

সনকা চাঁদের কাছে গিয়ে সব জানায় —

স্বামীর আগে বলে বিবরণ কথা
শুনিয়া চাম্পলার পতি হেঁট করে মাথা।

এরপর কন্যা সন্ধান — লক্ষ্মীন্দরের বিবাহে যাত্রার আগে সনকার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা, সনকার খেদ "তুই মোর বিবাহে না যাইও বাচ্চারে।" লক্ষ্মীন্দর যুক্তি দেয়

আগে মরণ পিছে মরণ মরণ একবার।
জন্মিয়া যমের ধার নাগে সুজিবার।

লোক জীবনে মৃত্যুকে সহজ করে নেবার শক্তি এই উক্তিতে সঞ্চারিত হয়ে আছে।

চাঁদ এবার পাইকদের যাত্রা করতে বলে —

চাঁদ বলে পাইকগণ নেও গুয়া পান।
বরকে রাখিতে তোরা হও সাবধান।। ...
এক বস্ত্র পরিধান পর সর্বপরি।
চিনিতে না পারে যেন (জয়) বিষহরি।

পাইকগণ তখন 'ডম্ফ' করে — 'আমরা থাকিতে মশাই কী করিতে পারে' পাইকদের ভয়ে গ্রামবাসীদের ত্রাস্ত অবস্থার চিত্র দিয়ে স্থূল পরিহাস করবার চেষ্টা হয়েছে। সঙ্গে আছে নারীদের সম্বন্ধে কিছু কৌতুক —

ভাট পালায়, ভাটিয়া পালায়, চণ্ডাল পালায় হাড়ি।
ঘরের ভিতর যুক্তি করে গাড়ুর গাড়ুর আড়ি।।
এক আড়ি বলে তোমরা পালাও কিসের ডরে
বিবাহে যায় সাধু উজানি নগরে।
যেইনা পাইক নিয়ে যাবে তার সঙ্গে যা।।
আন্ধিয়া বাড়িয়া পাইকের বুকে বসে খাব।

জোলা জোলাবৌকে নিয়ে কিছু গ্রাম্য রঙ্গ করা হয়েছে। এরপর পদ্মাবতীর কথায় কালীয় নাগ লক্ষ্মীন্দরের মাথায় বিষনিঃশ্বাস ফেলে। তাতে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হয়। চাঁদের চরিত্র এখানে মঙ্গলকাব্যের ভাষায় বর্ণিত দৃঢ়তা পেয়েছে।

শিবের ভরসা করি না পূজিলাম বিষহরি সেও শিব মোর নাধরে কাণ্ডার

যে পুত্র মরিয়া গেইচে তারে কিবা দয়া।
বাহির কর মরা পুত্র নিদারুণ হয়া।।

চাঁদ চরিত্রের দৃঢ়তা লোকনাট্যের রূপেও পরিস্ফুট হয়েছে। একদিকে আছে শিবের কৃপা না পাওয়ায় চন্দ্রধরের খেদ আর অন্যদিকে বিষহরির দংশিত পুত্রকে সব দুঃখ সহ্য করেও সৎকার করার জন্য বের করে দেওয়ার কথা। মনসা মঙ্গল কাব্যগুলিতে কাহিনীর এই গঠন পাওয়া যায়। বেহুলার ভক্তিতে পদ্মা সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে দেয়। সেখানকার বর্ণনা বিষহরি পালায় সংক্ষিপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যে বিস্তৃত।

ওগো শ্বশুর অপেক্ষা কর বেলা দুই প্রহর।
কালীদহে সেবিয়ার জিয়াবো নন্দন তোমারর।

কালীহে বেহুলা মনসার পূজা করে। পূজার আচার মনসামঙ্গলের অনুরূপ

বালী দশ আঙ্গুল দিয়া সলিতা জ্বালায়।
কেশ কাটিয়া বালী চামর ঢুলায়।
বালী বুক কাটিয়া এচান্নি সাজায়।
কাঠারীখান ধরে বালী যেন খুরের ধার।
গলাতে কাঠারী দিয়া চাহে মরিবার।

পদ্মা বেহুলা বালীকে বর দিলেন, তার শরীর সুস্থ করে দিলেন। বিয়ে হল। বিবাহে স্বজনবর্গের নানা দানের কথা লোক কবির বর্ণনায় উঠে এসেছে। বালার সঙ্গে শালাবৌদের রঙ্গ তামাসার কথাও আছে। এরপর বরবধূর বিদায়, সনকার বধূবরণ। বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের বাসর যাপন। বাসর ঘিরে পাহারা। এর মাঝে সনকা লক্ষ্মীন্দরকে জিগ্যেস করে — "ওরে বাবা লক্ষ্মীন্দর শ্বশুর বাড়িতে কী কী দান পাইয়াছ ?"

লক্ষ্মীন্দর বলে — ভূমিদান পাইয়াছি মাতা গো লখিয়ার কান্দর।
তার সঙ্গে পাইয়াছি মাতা বেহুলা সুন্দর।।
আর অনেক দান পেয়েছি মাতা লেখা জখানাই।
দুধ খাইতে পেয়েছি মাতা সবন্ধের গাই।

এই অংশটি সমাজের সাধারণ কৌতুক লিপ্ত মনস্তত্বের পরিচায়ক বলে গুরুত্বপূর্ণ। যৌতুক সম্বন্ধে বাঙালী ঘরের কৌতূহল এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। যৌতুক দান সম্বন্ধে কবিও ভূমিও গোদানের উপরে উঠতে পারেননি। নিজের পারিপার্শ্ব সম্বন্ধে, তাঁর সমাজপট সম্বন্ধে কবির যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাই এখানে কাজ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে লক্ষ্মীন্দর বেহুলার প্রথম রাত্রির বিবাহিত জীবনের কিছু বর্ণনা আছে। কেতকাদাসে বরবধূতে পাশা খেলার কথা পাই। লক্ষ্মীন্দর সেখানে পরাজিত হয়। বিজয়গুপ্তে পাশাখেলার কথা নেই কিন্তু লক্ষ্মীন্দরের রতি-বাসনা আছে। বিষহরা পালা পাশার খেলার উদ্দিষ্ট রতিবাসনা। লক্ষ্মীন্দর বলেছে —

আমি হারিলে দিব তোমায় অষ্ট অলংকার।
তুমি হারিলে দিবে আমায় সুরতি শৃঙ্গার।।

এরপর লক্ষ্মীন্দর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। বিবাহ রাত্রিতে বেহুলা রন্ধন করেছে। রন্ধনের বর্ণনা প্রথানুগত এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, কিন্তু লোকজীবনের পরিচয় হিসেবে মূল্যবান।

প্রথমতে আন্ধে বালী সাক সুগবরা ভাজা।
চুচুরা মৎস আন্ধে বালী দিয়া বাঁশের গাজা।।
রহুন আন্ধে সুন্দরী রন্ধনের জানে ভাও।
ঘৃততে ভাজিয়া তুলে কৌতরের ছাও।
রহুন আন্ধে সুন্দরী তার কানের নড়ে সনা।
তৈলতে ভাজিয়া তুলে শোল মাছের পহনা।।
নদীর খাটিয়া মৎস্য বেছে হালী হালী।
ডক দিয়া আন্ধে বালী কয়া শের জালী।।
বয়ালী মৎস্য আন্ধে তার নিকীলায় কোল।
অধ্যেক করে খাটা আম্বোল অধ্যেক করে ঝোল।।
বনীয়ার বৌ বানীয়ার বৌ রন্ধন ভাল জানে।
চেং মাছ পুরিয়া থালী জামুরী দিয়া সানে।।
রহুন আন্ধে সুন্দরী তার পিষ্টে পরে ছাই।
তাক দেখে হাস্য করে দুল্লব নখাই।
এক ভাত পঞ্চাশ বেঞ্জন করিলে রন্ধন।
নিদ্রাতে পড়িল বনিকের নন্দন।

লক্ষ্মীন্দর বাসর ঘরে ঘুমিয়ে পড়লে পদ্মা সর্প-দংশন করানোর জন্য সাপদের ডাকছেন। ডারাইশ, ধামাইয়া, ঘেউটিয়া, ঢোঁড়া, নাগিনী — এই সকল সাপ কার কতটা বিষ আছে পদ্মাকে জানাচ্ছে। লৌকিক নামে এই সাপগুলির পরিচয়। নাগিনীর দংশনে লক্ষ্মীন্দর মৃত্যুকোলে ঢলে পড়তে পড়তে গীত গেয়ে বলে —

'ও সুন্দরী তোর বাপের বাড়ি গেনু, বাটিভরা মুই দান পানু, ও কি সুন্দরী তাতে আসিল ভাই আগুন চেওয়ারী।' লক্ষ্মীন্দরের ধারণা উপহার সামগ্রীর ভেতরে কোনো বিষাক্ত বিছা লুকিয়েছিল। তার কথার মধ্যে শ্বশুর বাড়ীর প্রতি একটা খোঁটা দেওয়া থাকে। বেহুলা ঘুম থেকে উঠে 'পাটের মোড়া' ঝেড়ে ফেলতেই দংশনকারী নাগিনীকে

পানের 'সপুরা'-তে আটকে ফেলে। লক্ষ্মীন্দবের বাসরঘরে হঠাৎ করে পাটের গাট এসে গেল। কৃষকের ঘরে একটা সময় মজুত থাকে এবং সেখানে সাপও লুকিয়ে থাকে। এই চিত্রটিই এখানে উদ্ভাসিত। পুত্রের মৃত্যুশোকে চাঁদ ও সনেকা অস্থির হয়ে পড়েন। বেহুলাকে ঘন ঘন দোষ দিতে থাকলে বেহুলা শুনিয়ে দেয় —

আর আজি পুত্র মরিল বাবা আমার কুলক্ষণে।
অগ্রে তোমার ছয় পুত্র মরিল কেমনে।

চাঁদের নির্দেশে ওঝা শত চেষ্টা করেও ঔষধ এনে লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচাতে পারে না। পদ্মার চক্রান্তের কাছে হেরে যায়। ক্ষোভে চাঁদ বলেন—

— আরে লেংগা শিবের ভরসা করি।
না পূজিলাম বিষহরি।
সেও শিব ভাই না ধরে কাণ্ডার।
ওরে লেংগা শুন মোরে ভাই।
নেহ মরাপুত্র চল গড়গড়িয়া যাই।
যে পুত্র মরিছে ভাই তারে কি বা দয়া।
বাহির কর মরাপুত্র নিদারুণ হয়া।
গড়গড়িয়া ঘাটে গিয়া অনলে পোড়াই।
পদ্মাবতীর মুখে দেব মাটি আর ছাই।

পদ্মার প্রতি আক্রোশ চাঁদের আরো বেড়ে যায়। সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য পদ্মার মুখে মাটি আর ছাই দিতে চায়। দুঃখে ভেঙ্গে পড়া চাঁদের ব্যক্তিত্ব আরো প্রখর হয়ে ওঠে। বেহুলা শ্বশুর বাপকে অনুরোধ করে। কলাবাগান থেকে কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে দিক সে মৃত লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে ভেসে যাবে। এই অনুরোধে চাঁদ জানান—

আমি বধূ মা তোকে কেলা দিব না।
কেলা বেচাম আনা আনা মচকা দেড় বুড়ি।
তাক খায়া বাচিম হামরা দুই বুড়াবুড়ি।
বুড়া হমো বৃদ্ধ হমো লবণ কোথায় পামো।
পুড়িয়া কেলার মুড়া তাকে খার খামো।

লোকনাটকের এই মুহূর্তে চাঁদ আর সদাগর চাঁদ নন। হয়ে ওঠেন একজন অভাবী কৃষক। চাঁদের ভূমিকায় গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষটির মনে সম্পদ-অপচয়ের আতংক প্রকাশ পেয়েছে। কলা বিক্রী করে জীবন-যাপন এবং

কলাগাছ পুড়ে লবণের বিকল্প 'ক্ষার' তৈরী করবে চাঁদ আর চাঁদের স্ত্রী। পুত্রের বিয়োগ-ব্যাথা অদৃশ্য হয়ে গেছে। লোকনাটকের অভিনেতাদের জীবন-যাপনের ধরণও ফুটে ওঠে। অথচ কাহিনীর গতির মধ্যেও কোনো অসংগতি ধরা পড়ে না। শ্রোতা ও অভিনেতাদের মধ্যে কোনো রকম বিচ্ছিন্নতা থাকে না বলে হয়তো এরকমটা সম্ভব। জ্ঞাতিরা সচেতন করলে পুনরায় চাঁদ ফিরেআসেন নিজের চরিত্রে। নদীতে ভেসে যাওয়ার জন্য বাগান থেকে কলাগাছ কেটে 'ভুরা' তৈরীর আদেশ দেয়। মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা নদীতে ভাসে। মূল গায়ক বলছেন —

রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাই অবসর।
টলমল করে ভুরা জলের উপর।

দেবপুরীর যাত্রাপথে বেহুলার নানা বিপদ। পদে পদে পদ্মার নানা ছলনা। 'আলসিয়া নগরে' গোদার বাড়ি। নদীতে মাছ ধরতে ধরতে গোদা দেখে ফেলে বেহুলা সুন্দরীকে —

ও কন্যা কার বা ঘরের বিদ্যাধরী, জলে ভাস একেশ্বরী।
কন্যা প্রাণে কি তোর নাই কোন ভয়।

বেহুলার গীত —

'ও গোদা খাটে বসে মৎস মার
কেন গোদা ডাক পার হে
ও গোদা আমি নারী ভাই বড় অভাগিনী।
ও গোদা পূর্ব জনমের ফলে,
স্বামীকে খেয়াছে সাপ
মৃত লইয়া ভাই জল মধ্যে ভাসি।
ও গোদা কে আছে মোর এমন জন,
জিয়া দিবে মোর স্বামী ধন,
তারে আমি ভাই হব দাসের দাসী।

মৃতকে বাচানো জানায় না। এই সহজ-সত্যটি গোদা জানে। তাই সহজে বলে —

ও কন্যা কর পচা পরিহর
কাস্তুরী চন্দন পর। মৃত্যুকে ফেলিয়ে চল ঘর।

পতিব্রতা বেহুলা গোদার মনের ইচ্ছাকে বুঝতে পেরে দ্রুত তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা আঁটে। গোদাকে বাড়িতে যেতে বলে। তার দুই বউকে ঘর থেকে বের করে দিতে হবে। মূল গায়ক বলে ওঠেন—

তরাসে পালাইয়া যায়

কানী আর খুঁড়ী

পাছা বেড়া ভাঙ্গিয়া পালায়

গোদার মাও বুড়ি

দুই মাগ্যক বলে তোরা অন্য দেশে যাও

দুই পুত্র লয়ে তোরা ভিক্ষা করে খাও।

সুন্দরী রমণীর প্রত্যাশায় গোদা ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে দেয়। বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী দু'জনকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। নদীতে ছুটে এসে দেখে বেহুলা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সাঁতার দিয়ে ভেলা আটকিয়ে দেয়। বেহুলার কাতর প্রার্থনায় পদ্মা গোদার 'ঠ্যাং' টেনে ধরে। গোদা জলে হাবু ডাবু খেতে থাকে। গ্রামীণ কবি বা রচয়িতা অল্প কয়েকটি কথায় তা সুন্দর করে তুলেছে।

মূল গায়কের কথা —

তখন বালির মিনতি পদ্মা জানিল অন্তরে।

সেইখানে পদ্মাবতী কোন কর্ম করে।

ঠ্যাং ধরি গোদার তখন মারিলেন পাক।

উবু ডুবু করে গোদা ঢোকে পানী খায়।

হলদিয়া বেঙের মত চোখ দুইটা হয়।

গোদের চোখের দৃশ্য এবং অবস্থা দেখে বেহুলার কিছু কষ্ট হয়। বলে —

'গোদা তুমি ফিরিয়া যাও ঘর।

পাইবে অমূল্য নিধি সতী কন্যার বর।

আহত যোদ্ধার মত গোদা নদী তীরে দাঁড়িয়ে থাকে। বেহুলা ভেলা ভাসিয়ে চলে। সাধারণত, বিষহরি পালায় গোদার ভূমিকা দোয়ারী করে থাকে। দোয়ারী অভিনয় পটু। এই দৃশ্যে এসে একেবারে সাধারণ মানুষের আশাহত বেদনা নিয়ে দোয়ারী গোদার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

নদীপথে বেহুলার একের পর এক বিপদ আসে। শঙ্খ সাধু বানিজ্য করে নিজ রাজ্যে ফিরছেন। পরনারীর এই দুর্গতি দেখে তিনিও তাকে বিয়ে করতে চান। বেহুলার বুদ্ধিমত্তাতেই জানা যায় তারা পরস্পর ভাই-বোন। মৃত স্বামীকে বেহুলা বাঁচিয়ে তুলবে। তাকে এই প্রতিজ্ঞা থেকে শঙ্খ সাধু ফেরাতে পারেন না। বেহুলার প্রতি এরকম আচরণ করাতে শঙ্খ-সাধুর মনে পাপ-বোধ জেগে। এই পাপবোধ থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান।

শঙ্ক — ওরে বোন তুমি যা বললে আমি তাই করব। কিন্তু আমি যে নিজের ভাই হয়ে তোকে নিতে চাইলাম। এতে যে আমার বিরাট পাপ হইল। ইহার জন্য আমি এখন এ প্রাণ ত্যাগ করব বোন।'

শঙ্খ সাধুর চরিত্রে একজন অভিনেতা গদ্য-সংলাপে এ কথাগুলি বলেন। এর উত্তরে বেহুলা পদ্য-সংলাপে বলে—

দাদা ইহার জন্য দাদা না কর মনস্তাপ।
তুমি কি জান না দাদা যার যত পাপ।
তবে শুন দাদা, উঁচু জাগা সরবর নীচু জাগা পানী।
ব্রাহ্মণকে করিবে দান উত্তম দুধালী।
কুঘাটে ডুবিয়া দাদা সুঘাটে উঠিবে।
ভাইবোনের পাপ দাদা সেইখানে ভঞ্জিবে।

এই ঘটনার জন্য বেহুলারও অনুশোচনা হয়। তাই এটিকে ভাই-বোনের পাপ বলেছে। দাদাকে যা পরামর্শ দেয় তা প্রবাদে পরিণত — 'কু ঘাটে ডুবিয়া সুঘাটে উঠিবে।'

ত্রিপানী নদীর সম্মুখে ভেলা ভাসে। তিনদিকে সেই নদীর স্রোতের ধারা। দেবপুরীর পথ সংকুল হয়ে ওঠে বেহুলার। ছদ্মবেশী পদ্মার সাহায্যে বেহুলা বিপদমুক্ত হয়ে। নদীর তীরে নেতা ধোপানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। নেতা ধোপানীর মুখের কথায় দেবপুরের কোনো ভাষার চিহ্ন নেই। গ্রামের খেটে খাওয়া মহিলার মুখের ভাষা।

নেতা — সাত জন্মেও নাই মোর বোহিনির ছাও।
আর তুই কহেচিত মোক মাসি মাও।
তোক দেখছ মুই মানুষের বেটি
কেমনে আইলে তুমি দেবতার পুরী।

নেতাকে সাহায্য করে বেহুলা তার মন জয় করে। নৃত্য পটিয়সী বেহুলা নেতার সঙ্গে দেবপুরে যায়। শিব এবং ইন্দ্র তার নৃত্য দেখে মুগ্ধ। স্বয়ং শিব তাকে নিয়ে ময়নানগরে চলে যেতে চান। বেহুলার প্রার্থনায় ইন্দ্র শিবকে বলেন — "ওগো মহেশ্বর করি জোড় হাত। নটিনী হরিলে তোমার হবে সর্বনাশ"। বেহুলার প্রতি শিব সদয় হন। বেহুলার স্বামীর মৃত্যুর কারণ জানতে পারেন। তাই পদ্মাকে বলেন —

"বল পদ্মা তুমি বেহুলার স্বামীর প্রাণ নিয়েছ ?

পদ্মা — হ্যা পিতো, এটা আমার বিবাদিয়া মৃত্যু। তুমি সব জানো পিতো।

শিব — না পদ্মা যতই তোমার বিবাদিয়া থাক না কেন বেহুলার স্বামীকে ফিরে দিতে হবে।

পদ্মা — ওগো পিতা সত্য করুক বেহুলা দেবগণের আগে দেয়াইব ফুলজল শ্বশুরের হাতে।''

পদ্মার উক্তিতে 'বিবাদিয়া মৃত্যু'র কথা শোনা যায়। অনেক ঝামেলা-নির্ভর বিষয়কে 'বিবাদিয়া' একটি শব্দের মধ্যেই লোককবি দেখিয়েছেন। কাহিনীকে মূলগায়ক 'বলানি'র মধ্য দিয়ে আরো অনেক দূর নিয়ে যান। বেহুলা দেবতাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করে —

''যাবত পূজা না করিবে শ্বশুর সদাগর।
তাবৎ ফিরিয়া না যাইব ঘর।''

পদ্মা খুশী হয়ে ধনন্বতরী সেজে মৃত লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে তোলেন। গ্রামের ওঝাদের ঝারণ-প্রক্রিয়ার দৃশ্য এখানে ভেসে ওঠে। বেহুলা সুযোগ বুঝে পদ্মাবতীকে দিয়ে মৃত ছয় ভাশুরকে জীবিত করে নেয়। শ্বশুরের ধনজন চৌদ্দ ডিঙ্গা সব ফিরে দেবার ব্যবস্থা করেন পদ্মা।

বেহুলা — ওগো মা পদ্মাবতী আমার শ্বশুরের ধনজন চৌদ্দডিঙ্গা তুলে দাও।

পদ্মা — হ্যা মা বেহুলা, আমি তাই করব মা।

মূল গায়ক গীতে বর্ণনা দেন কীভাবে দৈত্য জলে ডুবে ডিঙ্গা তোলে। মধুকর, হাজারী, হেকা, হিরা, হুরা বিভিন্ন নামের ডিঙ্গা জলের উপরে ভেসে ওঠে। বেহুলা দেব-দেবীদের প্রণাম করে মধুকর ডিঙ্গায় ওঠে লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে চম্পকনগরের দিকে যাত্রা করে।

নদীর তীরে — তখন চাঁদের ঘরের নারীগণ ঘাটে ভরে পানি। ছয় ভাইএর নৌকা দেখি করে ঠারাঠারি
জল ভরিয়া নারীগণ করিল গমন। আপনার গৃহে যারা দিল দরশন। শুন শুন শ্বশুর বাপ বলি তোর ঠাঁই। ঘাটেতে আইসাছে তোমার দুর্লভ লখাই। তখন হস্তে লাঠি লইয়া সাধু করিল গমন। আপনার ঘাটে যাইয়া দিল দরশন।

চাঁদ উল্লাসে ভেঙ্গে বলেন — চল চল পুত্রবধূ চল যাই বাড়ি। দেখুক স্বামীর মুখ ছয় বধূ আড়ি।

বেহুলা চাঁদকে বলে ওঠে — শুন শুন শ্বশুর বাপ কথা শুন মোরে। দিতে হবে ফুল জল পদ্মার গোচরে।

চাঁদের হাট বসেছে চাঁদসদাগরের বাড়ীতে। বেহুলার সব কথায় রাজী হয়ে যান — হ্যা, মা বেহুলা, সত্য করিলাম তোমার সাক্ষাতে দেওয়াইবো ফুলজল পদ্মার গোচরে।'

কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ তাঁর জেদ রেখেই দেন —

'কিন্তু যে হস্তে পূজা করি দেব শূলপানি। সেই হস্তে না পূজিব কানি বিষহরি।

তাতে কি তুমি হবে রাজি ?''

এর উত্তর বেহুলাকে দিতে হয় না। পদ্মাদেবী নিজেই চাঁদের সম্মুখে আসেন। খুশীতে বলেন —

''হ্যা, দাদা আমি তাতে রাজি।''

লক্ষণীয়, পদ্মা এখানে চাঁদকে দাদা বলে সম্বোধন করছেন চাঁদের পৌরুষের কাছে পদ্মা অনেক ম্লান। তাতে পদ্মাবতীর কোনো দুঃখ নেই। প্রভাবশালী চাঁদের বাম হাতের পূজোতেই পদ্মাবতী খুশী। পালানাটকের কাহিনীর শেষে মূল গীদাল পদ্মার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকেন। করেন গৃহস্থের মঙ্গল কামনা। মূল গীদাল পদ্মার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে গানের মাধ্যমে বিদায় দেন। শেষে সমগ্র আসরে পদ্মার আবির্ভাবের একটি ভ'ব জেগে ওঠে। এভাবেই বিষহরি পালানাটকের অভিনয় শেষ হয়

'' 'নটুয়া' — বিরোগের গান''

উত্তরবাংলার তরাই অঞ্চলে রাধার বিরহ নিয়ে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে সৃষ্টি 'নটুয়া'। এই অঞ্চলে 'নটুয়া' 'বিরোগের গান' রূপে প্রচলিত। রাধা-কৃষ্ণ সংক্রান্ত লোকনাটকে মঞ্চে রাধা ও কৃষ্ণের উপস্থিতি দেখা যায়। 'নটুয়া' পালা যেহেতু রাধার বিরহের গান তাই এ নাটকে কৃষ্ণের শরীরী উপস্থিতি নেই। কৃষ্ণ-বিরহের আর্তি এই লোকনাটকের মুখ্য বিষয়। এখানে অনুপস্থিত কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধার হৃদয় বেদনার প্রকাশ ঘটে।

দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে, শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চল যথাক্রমে মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ী ও খড়িবাড়ী এলাকায় নটুয়ার প্রচলন দেখা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে পুরনো বৈকুণ্ঠপুর এলাকার রাজগঞ্জ, একটিয়াশাল ও ডাবগ্রাম অঞ্চলেও 'নটুয়া' পালাগান পরিচিত। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশ রামগঞ্জ, চোপড়া ও ইসলামপুরের গ্রামাঞ্চলে এর প্রচলন আছে। বিহারের উত্তর প্রান্তে ঠাকুরগঞ্জ, কিষানগঞ্জ ও চুল্লী অঞ্চলের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় 'নটুয়া'র প্রচলন দেখা যায়। ড. শিশিরকুমার মজুমদার তাঁর উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য গ্রন্থে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ হেমতাবাদ কালিয়াগঞ্জ অঞ্চলে নটুয়ার প্রচলনের কথা বলেছেন। জলপাইগুড়িরর নটুয়ার সঙ্গে রায়গঞ্জ অঞ্চলের নটুয়ার পার্থক্যের কথা বলেছেন। স্থানের দিক থেকে বিহার সন্নিহিত উত্তরবঙ্গে নটুয়ার প্রচলনের কারণে একে কেউ কেউ বিহারের প্রভাবজাত বলে মনে করেন।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত-এর একাদশ অধ্যায়ের 'বিচিত্র' পর্বে নটুয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তিনি নটুয়াকে ব্যাতিক্রম-ধর্মী পালাগান বলেছেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে 'কালী' বন্দনার কারণ তিনি বুঝতে পারেননি। উল্লেখ্য রাধা বিরহের এই পালার বন্দনাংশে কালীর বন্দনা করা হয়। উধব ও মাধবের ভূমিকাও এখানে অন্যান্য লোকনাটকের থেকে আলাদা।

নটুয়া গানের দুটি ধারা। একটি বিরহ আর একটি কুঞ্জ। এখানে 'বিরহ' কথার প্রচলন নেই। বিরহকে 'বিরোগ' বলা হয়। 'নটুয়া' বিরহের গান। রাধিকার বিয়োগ ব্যথাই নটুয়ার মূল উপজীব্য। এই ধারাটিই প্রচলিত। 'কুঞ্জ' পর্যায়ের ধারাটি একেবার বিলুপ্ত। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লালদাস মৌজায় বিচ্ছিন্নভাবে এর সামান্য নিদর্শন পাওয়া যায়। 'কুঞ্জ' পর্যায়ের পালাগানে রাধিকার 'কুঞ্জ' নির্মাণ এবং গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করার কথা গানে ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণের উপস্থিতি এবং তার সঙ্গে রাধিকার লীলার কথা 'কুঞ্জ' পর্যায়ে পাওয়া যায়। এই ধারার পালাগানটি কেন বিলুপ্ত হলো অবশ্যই তা অনুসন্ধানযোগ্য। কিন্তু 'নটুয়া-বিরহ'-এর পালাগানটি অভিনীত হচ্ছে।

'কুঞ্জ' পর্যায়ের গানে হাস্য, মাধুর্য উচ্ছলতা সবই ছিল। নটুয়াতে রয়েছে শুধুই বিয়োগ ব্যথা। সেই বেদনা নিয়েই এ গানের শুরু, বেদনাতেই এ গানের শেষ।

'নটুয়া'-র শব্দার্থ নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর গ্রন্থে নটুয়া-র অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের ৩৫৭ সংখ্যক গানের এক জায়গায় আছে —

'চ্যাং মাছ নটুয়া ভাইরে
ভালো নাচন জানে
সব মাছে যুক্তি করি
চ্যাংয়ের নাচন দ্যাখে।'[৩৯]

এই অংশের মধ্যে 'নটুয়া' শব্দটি নাচের অর্থকে ব্যঞ্জিত করছে। নৃত্য বা অভিনয় বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির অর্থ নটুয়া শব্দে প্রকাশ পায়। নটুয়ার প্রচলিত অর্থ নট কিংবা নর্তক। সেদিক থেকেও 'নটুয়া' নামের তাৎপর্যে থাকতে পারে নৃত্যগীতময় কোন উপস্থাপনা। নির্মলেন্দুবাবু নটুয়া গানকে বিহারের লোকসঙ্গীত বলতে চান। এমনটা অসম্ভব নাও হতে পারে। 'নট্ট' শব্দটি বিহারী হিন্দি উচ্চারণে এমনটা হতে পারে। তা থেকে বাংলায় 'নটুয়া' এসে থাকতে পারে। ডঃ গিরিজাশংকর রায় মনে করেন 'নটবর' শব্দ থেকেও নটুয়া আসতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম নটবর। কিন্তু এই 'নটবর' শব্দটি নটুয়া পালাগানে কোথাও চোখে পড়ে না। তাছাড়া নটবর শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তনে নটুয়া হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব রাঙ্গাপানির বনিজোত গ্রামের বসিন্দা বালিমোহন সিংহ 'নটুয়া' গান করেন। তিনি পাশাপাশি বিষহরা বা মনসা পূজারও গানও করেন। বিষহরা গান তাঁর কণ্ঠস্থ। এই শিল্পী বলেন শ্রী রাধিকা নাচে, কান্দে, নট করে সেইজন্যে আমরা একে নটুয়া বলি। নট করা শব্দের অর্থ নাটকীয় আচরণ করা।

তিনি বিষহরা গান থেকে একটি পদ উল্লেখ করেন —

নট করে নটুয়া গাইন করে গীত
মেন্ড ঘরে বালা-বালী হইলো উপনীত।

এই অঞ্চলের বিষহরা গানের পদের মধ্যে এইভাবে নটুয়া কথাটির প্রয়োগ পাওয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে বাক্যহীনা হয়ে নৃত্যের দ্বারা নিজের বেদনাকে প্রকাশ করেন। এজন্য এই পালা 'নটুয়া' রূপে পরিচিত। কিন্তু এতেও নটুয়া কথার অর্থ এতেও স্পষ্ট হল না। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলে যে লেটোর গান প্রচলিত আছে তার মূলে নাটুয়া কথাটি ছিল। নাটুয়া নেটো লেটো — এইভাবে তার ধ্বনিগত রূপান্তর হয়েছে। সুকুমার সেন তাঁর 'নট নাট্য নাটক' বইতে প্রাচীনতর নাটুয়া নৃত্যের কথা বলেছেন[৪০]। নাটুয়া নৃত্য বলতে তিনি গীতিনাট্য

কথাটি বুঝেছেন। আর নাটুয়া কৃত্য কথা থেকে নেটো লেটো নামক এক শ্রেণীর লোকনাট্যের কথা বলেছেন। "নাটুয়া কাচ হল নেটো — এই তাঁর অভিমত[৪১]। বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক গ্রন্থে ব্রজগোপাল বৈষ্ণব একটি প্রবন্ধে লিখেছেন উত্তর দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রঙ্গরসাত্মক ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়ার আকারে ধাঁধা ও গানের সমন্বয়কে বলে 'লটুয়া'। তিনি লটুয়াকে বলেছেন খন-এর রূপভেদ। বলা বাহুল্য গ্রামীণ উচ্চারণে যা 'লটুয়া' তা কোথাও কোথাও নটুয়া রূপে উচ্চারিত হয়। লটুয়া গানের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই প্রবন্ধে যার উল্লেখ করা হয়েছে তা এই ধাঁধা ও গানের জোরে তৈরী। আমাদের সংগৃহীত নটুয়া — বিরোগের গানও এই রকম ধাঁধা ও গানের মিশ্র রূপ।

মনে হয় প্রশ্নোত্তরের ছাঁচে এক সময় গ্রামীণ জীবনে নানা জ্ঞানের চর্চা চালু ছিল। লোক সমাজে প্রচলিত ধাঁধা সাহিত্যের প্রাচুর্য দেখে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে লোক জীবনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেমন বলা হত তেমনি তাকে কিছুটা গূঢ়ভাবে প্রকাশ করার মধ্যে বুদ্ধি চর্চার ভূমিকাও ছিল। বুদ্ধি সহকারে এই গূঢ়োক্তির রহস্য ভেদ করতে পারলে তবে যে আনন্দ পাওয়া যায় এর রস সেই শ্রেণীর আনন্দ। এ ভাবরসের আনন্দ নয় বুদ্ধিগম্য এর ভাব। এই ভাবে জীবনের নানা রহস্য বা বাস্তব শিক্ষা অধ্যাত্ম শিক্ষা এই ধাঁধার মাধ্যমে দেওয়া হত। এই পদ্ধতি খুবই প্রাচীন লোকশিক্ষার পদ্ধতি। করে এর সূত্রপাত বলা যায় না। তবে দেশে বিদেশে তার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে লোক জীবনের এই ধাঁধা বলার রীতিটি বহু প্রাচীন। কিন্তু তার মধ্যে একঘেঁয়েমি থেকে যায়। তাই তার সঙ্গে গানের যোগ হয় — এই ধাঁধার একঘেয়েমির মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য আনবার জন্যে। উত্তর দিনাজপুরে থাকে বলে খন - লটুয়া - সম্ভবত এ থেকেই তার উৎপত্তি। শিশিরকুমার মজুমদার যে নটুয়ার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন তাতে এই 'ফাকড়ি' বলার সঙ্গে সঙ্গে আছে রাধার নৌকা পারাবারের গান। সেটা বিরহের নয়। রাধা সেখানে বলছে "পার কর নিলাজ কানাই রে বেড়ি বাক চাই। নষ্ট হবে দহি দুধ বিক্রি বহে যায়।"[৪২] "রাধা ও কৃষ্ণের এই গানের ভূমিকার পর আসছে ফাকড়ি অর্থাৎ ধাঁধা বলা। কাজেই এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ধাঁধা বা ফাকড়ি বলার মধ্যেই সঙ্গীত যোগে ও নৃত্য যোগ এ ধরনের নটুয়া পালার উৎপত্তি।

সাধারণত দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর পর থেকে কালীপূজা পর্যন্ত নটুয়া পালাগান বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজার পরও প্রয়োজন অনুসারে বা বিশেষ আমন্ত্রণে নটুয়া অনুষ্ঠান হয়। বর্তমানে যে সম্পূর্ণ পালাটি সংযোজিত হয়েছে সেই পালাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পূর্ব রাঙাপানির বনিজোত গ্রামের শ্রী বালিমোহন সিং-এর নিকট থেকে সংগৃহীত। প্রায় ১২ জনকে নিয়ে এই গঠিত দলটি শ্রীবালিমোহন-এর নেতৃত্বে লোকনাট্য উপস্থাপনা করে। এই দলের মূল গীদাল শ্রীবাজারু সিংহ নৃত্যগীতও অভিনয়ের কৌশলটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই নাটকের মূল দুটি চরিত্র উধব ও মাধবের অভিনয় করেন যথাক্রমে শ্রী বালিমোহন সিংহ এবং শ্রী হরিকান্ত সিংহ।

রাধিকার বেশে নৃত্য করেন শ্রী বীরেন সিংহ। দলটিতে বাজনাদারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ ও জুড়ি (করতাল) সহযোগে গোটা পালাটির অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমথু সিংহ মৃদঙ্গ বাজানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত পটু। জুড়ি বা করতাল ঠিক তাল মিলিয়ে বাজান শ্রী সুমেল সিংহ। আরো দু-তিনজন শিল্পী থাকেন তাঁদেরকে বলা হয় 'গান-ধরা' লোক। মূল গীদাল বা গায়ক গান শুরু করলে গানের ধুয়া ধরে অন্যরা গান শুরু করেন। এই গানের ধুয়া যাতে কখনো তাল ভঙ্গ না হয় তার জন্য মঞ্চে স্থায়ী দুই থেকে তিন জন গান টানার লোক থাকেন। এই লোক শিল্পীদের বসবাস এলাকা রাঙাপানিকে ঘিরেই। এরা প্রত্যেকেই কম-বেশী কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত। তবে গ্রামীণ পরিকাঠামোয় ক্ষুদ্র শিল্পের যেখানে বিকাশ ঘটেছে সেখানেও অনেকে শ্রমিক বা গ্রামীণ শিল্পী হিসেবে যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। রাঙ্গাপানি রেল স্টেশনেও অনেকে মজুরের কাজ করেন। রেল-সভ্যতার দ্রুত গতিতেও তাঁদের কণ্ঠে নটুয়া এখনো অব্যাহত।

নটুয়া লোকনাটকের মঞ্চ বা আসরের জন্য কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান নির্বাচন করতে হয় না। গৃহস্থের বাড়ীর বাইরের উঠান বা খোলানবাড়ীতে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। এখন সরকারী বদান্যতায় লোক-উৎসব অনুষ্ঠান পরিশীলিত মঞ্চেও অভিনীত হয়। তবে সেই সব মঞ্চে এই গ্রামীণ লোক-শিল্পীরা অভিনয় করতে অনেক ক্ষেত্রে একটা চাপা অনুভব করেন। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশ বয়স্ক পুরুষ-মহিলারাই থাকেন।

বাড়ির বাইরে খোলা স্থানে একটি বৃত্তাকার স্থান নির্বাচন করা হয়। তার তিন দিক ঘিরে শ্রোতারা বসবেন। বৃত্তাকার আসরে প্রথম সারিতে বাজনদাররা বসবেন। তাঁদের পাশেই বসে থাকবেন শ্রী রাধিকা। কিশোর বয়সের হালকা চেহারার মেয়েলী মুখাবয়বের ছেলেরাই রাধিকা সাজেন। সেই শিল্পীকে নৃত্যে অসম্ভব পটু হতে হবে। প্রয়োজন মতো বাজনদারদের জায়গা থেকে উঠে এসে রাধিকা আসরের সম্মুখে নৃত্য করবে। মূল গীদাল সম্পূর্ণ পালাগানটিকে গান ও কথার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সবচাইতে আকর্ষক দুটি চরিত্র — উধব এবং মাধব — বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হবেন। তাঁদের উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে একটা হাস্যরস সৃষ্টি করবে। তাঁরা দুজনেই মূল গীদালের সঙ্গে বিভিন্ন ধাঁধা-র মধ্য দিয়ে তর্ক-বিতর্ক ক'রে ক'রে নাটকটিকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন। চরিত্রগুলির সাজ-সজ্জাও অতি সাধারণ। মুখে মেক-আপ করবার জন্য সাধারণ ভ্যানিশিং ক্রিম, পাউডার, লাল রং, রাংতা ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। রাধিকার পরনে ঘাগরা থাকে। মূল গীদাল ধূতি, পাঞ্জাবী বা ফুল সার্ট এবং গলায় একখণ্ড লম্বা সাদা কাপড় পরেন। উধব-মাধব মাথায় জোকারদের মতো লম্বা টুপি পরেন। মুখে সাদা রং-এর উৎকট ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পুরোনো চাপা পা-জামা বা খাটো করে ধুতি পরেন। চরিত্রের ঢং অনুযায়ী পোশাক-পরিধান লক্ষ করা যায়।

নটুয়া পালা বা লোকনাটকটির কাহিনী অত্যন্ত ছোটো। ফুলবাগানে ফুল তুলতে গিয়ে শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেলেন। ফুল বাগানে তন্ন তন্ন করে খুঁজে রাধিকা আর কৃষ্ণকে খুঁজে পান না। কৃষ্ণ বিহনে

রাধিকা বিরহে কাতর হয়ে ওঠে। এই কাতরতাকে ঘিরে মূল গীদাল গান শুরু করেন। উধব ও মাধব কৃষ্ণের দুই ভাগ্নে সর্বদাই রাধিকা অর্থাৎ মামিকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে মামা অর্থাৎ কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। দুঃখের কোনো কারণ নেই। কিন্তু রাধিকা সেটা মানতে চান না। মূল গীদাল উধব-মাধবকে গান ও কথার মাধ্যমে বোঝাতে থাকেন তাদের মামি রাধিকার দোষেই কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন। মূল গীদালই আবার রাধাভাবে ভাবিত হয়ে গান করে রাধিকার বেদনার কথা ব্যক্ত করেন। সেই গানের সঙ্গে প্রয়োজন মতো বাক্যহীনা রাধা মঞ্চে নৃত্য করে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে 'বতেয়া' একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই বতেয়ার জন্য আলাদা ব্যক্তি থাকেন না। উধব-মাধবই বতেয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন।

নটুয়া লোক নাটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো এই এলাকার লোকভাষায় ফাকড়ি বা শ্লোক। গীদাল শ্লোকের উত্তর দেবেন। উধব-মাধব শ্লোক বলবে এমনভাবে যা নাটকীয় ঘটনার কোনো ছন্দ-পতন ঘটাবে না। এই ভাবে গান, কথোপকথন ও শ্লোকের মধ্যে দিয়ে ঘটনা এগিয়ে চলবে। রাধার কষ্ট এবং যাতনা মূল গীদাল গানের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেন। এই কষ্ট এবং যন্ত্রণাকে হাল্কা করার জন্য উধব নিজে আবার কখনো বতেয়ারূপে মাধবের সঙ্গে শ্লোক বা ধাঁধার মধ্য দিয়ে গায়ককে প্রশ্ন করে। এই শ্লোকগুলো পরিবেশনের ধরণ এমন সুন্দরভাবে করা হয় তাতে নাটকীয় অভাব ঘটে না। মূল গায়ক উধব এবং মাধবকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে কৃষ্ণ তাদের মামিকে ছেড়ে চলে গেছে। এটা উধব-মাধবের নিকট অবমাননার সমতুল। তারা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এড়িয়ে শ্লোকের মধ্য দিয়ে মূল ঘটনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু মূল গায়ক শ্লোকের যথাযথ উত্তর দিয়ে কথা কিংবা গানের মধ্যে দিয়ে পুনরায় রাধিকার বিরহ বিয়োগের কথা ব্যক্ত করেন। নাটকের গানে চলে বিরহ আর পদ্যে সেই বিরহ বেদনাকে লঘু করে দেবার চেষ্টা। এই ফাকড়ি বা শ্লোকগুলোর কাব্যমূল্য অবশ্যই বিচার্য। নীতি শিক্ষা, তাৎক্ষণিক বিচার বুদ্ধি এই শ্লোকগুলোতে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ পেয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পালা গান আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি পালাতে রাধার অভিনয় সংলাপ ও গীতের মধ্য দিয়ে পালাগান উপস্থাপিত হয়। ব্যতিক্রম নটুয়া নাটকে। এখানে রাধিকা নিজে কোনো কথা প্রকাশ করবে না। নৃত্যের মধ্য দিয়েই, বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমেই রাধিকা তার বেদনাকে শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরবে।

বন্দনা দিয়ে পালাগান শুরু হয়। বন্দনার সময় আসরে উপস্থিত সব শিল্পীই বন্দনার গানে অংশ গ্রহণ করেন। বন্দনার সঙ্গে নৃত্যও চলে। বন্দনাংশে কালীমায়ের স্মরণ নেওয়ার ব্যাপারটা নিতান্ত লৌকিক বিশ্বাসের ফল। নির্মলেন্দুবাবু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে 'কালী'র উল্লেখ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বিস্মিত হবার কারণ নিশ্চয় আছে। কিন্তু লোক-কবির নিজস্ব বিশ্বাস বা আঞ্চলিক কারণে কালীর প্রতি নির্ভরতা এর কারণ বলে মনে করি।

বন্দনা অংশে কবি কিংবা গায়েন তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী দেবদেবীর বন্দনা করেন। কাজেই এখানে কালীমায়ের উপর নির্ভরতার মূলে সেই লোক বিশ্বাস আছে। কবির নিজের ধর্মবিশ্বাস এবং নাটকের পাত্রপাত্রীর অবস্থানগত সামঞ্জস্য এতে হয়তো রক্ষিত হয়নি, কিন্তু এখানে এই দুটিকে আলাদা করে দেখতে হবে। শিশির মজুমদার উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য গ্রন্থে যে নটুয়া পালা সন্নিবেশিত করেছেন তাতে রাধা কৃষ্ণ দুয়েরই উক্তি আছে। কিন্তু কেউ রাধা বা কৃষ্ণ সাজে না। মূল গীদাল এবং একজন সহকারীরাধার কৃষ্ণের গান করেন।[৪৩] ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু না বলেও লিখেছে "শ্রীরাধা বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়া লোক কবির চোখে সাধারণ নারী হইয়া উঠিয়াছেন।"[৪৪] এখানে রাধার সাধারণ নারীরূপ গ্রহণের কথাআছে।

বন্দনাংশের নৃত্য থেমে গেলে মূল গীদাল শুরু করেন —

হাতে লিনু বাটারে মুই
মিঠাপান
কাহাসে আইলো রাধাগে
দশমুনিক করিস পরনাম।

গান শেষ না হতেই বতেয়া বা দোহার গানের ধুয়া ধরে গান চালিয়ে যেতে থাকবে। যখন মূল গীদাল উধব-মাধবকে উদ্দেশ্য করে কথা শুরু করবেন তখন গান বন্ধ হয়ে যাবে। মূল গীদাল বলবেন —

উধব, তোর মামীটা কান্দিসে,
তোর মামাতো না আসে।

এই কথার সূত্র ধরে পয়ারের আকারে মূল গীদাল বলবেন —

খাটোখুটো বিন্দাবনে
ফুল তুলিনু হামা তিনজনে,
ফুল তুলিতে হারানুং স্বামীরে
সোয়ামী গেইসে মোর বিন্দাবনে।

রাধার কথা গীদালই বলে যান "এঠে হারালো মোর সোয়ামী" — স্বামী হারার দুঃখের সরল প্রকাশ ঘটে এই উক্তিতে। কিন্তু এই দুঃখের অনুভূতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে উধব মাধব তাকে লঘু করে দিতে চায়, শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে তারা একেরে পর একে 'ফাকরি' অর্থাৎ ধাঁধা বলে, কৃষ্ণের হারিয়ে যাওয়ার নানা কারণ দেখাতে চায়—

মামা, ভাত শাকোত নুন নি পায়

তাতে রাগ করি পালাইচে।

হামাক মামাক অনষেবার যাবা হবে।

মূল গীদাল রাধার ভাবে আবার গান শুরু করেন —

এখেতো আন্ধার রাতি

একালরে রহালনি যায়

ওহো পরভুজি

হায়, দেখি মোর কপালের নেখা রে

জার গেলো মোর কাপড়া বিনে

বয়স গেলো সোয়ামী বিনে

একালরে রহালনি যায়

গোকুলা নগরে ওহে পরভুজি।

এই বেদনাকে হাল্কা করবার জন্য কিংবা রাধিকার বিরহকে ভুলে থাকার জন্য উধব দর্শক-শ্রোতাদের সম্মুখে মূল গায়ককে শ্লোকের মাধ্যমে প্রশ্ন করে বসেন —

ক্ষুদ্র বর্ণ বিত্তা নাল বর্ণ দেহ

ছালেবা ছালেবা সর্ব অঙ্গ ধরে

অধিক করি খাইলে

তোর মুখখ্যান গন্ধ করে।

শ্লোক শুনে মূল গীদাল হেসে বা নাটকীয় ভঙ্গীতে উত্তর —

'হে উধব, তুই যে পিয়াজটার কথা কলু।'

নটুয়া পালায় রাধার কৃষ্ণ বিরহের বেদনা যে গভীরতা পায় না, তার একটা কারণ রাধার বিষণ্ণতাকে আমল না দিয়ে সহকারী উধো মাধো নানা রকম বাধা বলতে থাকে। এই ধাঁধাগুলি শ্রোতাদের মনকে রসসিক্ত করবার চেয়ে তাকে বুদ্ধিজাগর করে তোলে। বস্তুত রাধা বিরহের পদগুলির বেদনার যে নিবিড়তা তাকে এই লোক কবিরা ধরতে পারেননি। নটুয়া "বিরোগের" গান ঠিকই কিন্তু তাতে বিরহের বেদনার প্রকাশ অত্যন্ত সরল। এখানে সংযোজিত নটুয়া পালায় রাধার দুঃখের কথা বলা হচ্ছে — তার পাশাপাশি বলা হচ্ছে নিতান্ত লৌকিক ধাঁধা — অনেক সময় তা লোকরুচির স্থূলতার পরিচয়বাহী হয়ে ওঠে। নটুয়াপালার যে গানগুলি গাওয়া হয় তাতে একবার রাধার দুঃখ গীদালের কণ্ঠে আর তারপরেই ধাঁধার ফুলঝুরি। এই ধাঁধা বলাটাই মনে

হয় নটুয়া পালার একটা আকর্ষণ। গ্রামীণ জনসমাজে এই ধাঁধার মূল্য ছিল। শুধু লোকসাহিত্যের বিষয় হিসেবে নয়, ধাঁধার মধ্যে লোকমনের বুদ্ধিটার রূপ পাই। ধাঁধার আকর্ষণই এখানে লোকদের টেনে আনে। 'নটুয়া' পালার যে কাহিনীটি এখানে সংযোজিত হয়েছে তাতে রাধা-কৃষ্ণ-হারা। কৃষ্ণ তার স্বামী। স্বামীহারা রাধার বেদনা যদি এর প্রধান উপজীব্য হয় তাহলে তার সেই বেদনাকেই তীব্রতর করে তোলো লোককবির পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তার পরিবর্তে দেখি একের পর এক ধাঁধা বলে, উধব মাধবের রহস্য পরিহাসের মধ্য দিয়েও, এই বেদনাকে লঘুতর করে তোলা হয়েছে। নটুয়া গানের যে পালাটি শিশির মজুমদার সংকলিত করেছেন তাতে এই বিরহের কথা তেমন নেই।সেখানে রাধা কৃষ্ণ উভয়েরই কথা আছে — রাধা কৃষ্ণের ভাঙা নৌকোয় পার হচ্ছেন — এতে বোঝা যায় সেই পালাটি নৌকালীলার অনুসরণ। কিন্তু সেখানেও আছে এই ধাঁধার ব্যবহার। এখানে উদারভাবে একটা অনুমান করা যায়। মনে হয় নটুয়া পালার এই ধাঁধাগুলি এই লোকনাট্যের প্রাচীন অংশ। ধাঁধা বলা এবং তার উত্তর দেবার মধ্যে একটা উত্তেজনা জনিত আনন্দ কাজ করে। এই ধাঁধাগুলি প্রায়শই সন্ধ্যাবেলাকার অবসরে বলা হয়। নটুয়া পালাগানে এই ধাঁধারই বাহুল্য দেখে মনে হয় ধাঁধা, হয় ধাঁধা বলাটাই এই নটুয়া লোকনাট্যের প্রাচীনরূপ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের গান। এই গান যুক্ত হয়েছে অনেক পরবর্তীকালে। গীদাল গানের মধ্য দিয়ে রাধিকার বেদনা এবং তারই কর্মের জন্য কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গেছে, এই ধরনের ঘটনাগুলোকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করতে থাকেন। উধব-মাধব বরাবরই শ্লোকের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর পেতে থাকে। নটুয়া-বিরোগের গান রাধার বিরহ ব্যথার গান। এই বিরোগের গানের কোনো কোনো অংশ কাব্যময়। আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা হলো নটুয়া গানের সম্পূর্ণ অংশ — তা থেকেই বোঝা যাবে এর কাব্যমূল্যের গুরুত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাধার বিরহের কোনো কোনো পদের সঙ্গে এর দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গির মিল দেখা যায়, যেমন—

হাতের শাংখা করিমু দূর
গায়ের বস্ত্র করিমু দূর
দূর করিম নয়নের কাজল
সীথার সেন্দুর।

আরেকটি পদ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে —

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।

এই পদটি 'নটুয়া'-গানের একটি পদের কথা মনে করিয়ে দেয় —

"মনের আগুন তলে জ্বলেরে
নেকটের আগুন ধায়
জ্বলেছে মনের আগুন
সখিরে কি খাইলে জুড়ায়।"

এখানে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বিরহ কাব্যের বর্ণনার সঙ্গে যে সাদৃশ্য, তার কারণ লোককবির কল্পনার সাধর্ম্য। লোককবির কল্পানায় স্বামীহীনার খেদ সমস্ত বিলাস দ্রব্য ছেড়ে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ত্যাগের ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছে। নারীমনের কামনা প্রকাশের ক্ষেত্রে আগুনের উপমা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। এগুলি উপমান ব্যবহারের গতানুগতিক রীতির অনুসরণ। লোককবির পক্ষে এই উপমান ব্যবহারের সারল্য এবং তার মাধ্যমে মানব-মনের বিরহানুভূতির প্রকাশ ভালো হয়েছে। তবে সামগ্রিক বিচারে এর কবিত্ব কিছুই নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার যে মানসিক অবস্থান্তর ঘটেছে, তার ফলে শেষ পর্যন্ত তার বিরহানুভূতি এক তীব্র আর্তিতে প্রকাশিত হতে পেরেছে। অন্য পক্ষে এসব লোকনাটকে সেই পরিসর কিংবা সেই সামর্থ্য দেখা যায় না। আমার মনে হয় নটুয়া পালায় রাধার বেদনা প্রকাশটাই লক্ষ্য নয়। বরং তার বিরহকে কিছুটা সহনীয় করে বাস্তব সমাজে সংসারের উপযোগী করে তোলাও এর লক্ষ্য। দুঃখ বেদনা বিরহ বিচ্ছেদ সবই সামাজিক মানুষকে আক্রান্ত করে, আচ্ছন্ন করে। তাকে কাটিয়ে উঠে সহজ জীবনকে গ্রহণ করতে হবে। লোক কবির কল্পনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ সাধারণ সংসারের নরনারীতে পরিণত হয়েছে। সেখানে বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব প্রত্যাশা করা যায় না।

ফলে দেখা যায় গানের শেষে রাধা বিরহ বেদনা ভুলে যাচ্ছে। "পাসরিমু মুই সায়ার শোক।" পরন্তু রাধা উধবের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এদিক থেকে পালাটি বিচারযোগ্য। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের বই থেকে দেখতে পাই কুঞ্জ সাজানোর আগে রাধা উঠোন ঝাট দিচ্ছেন। এ নিশ্চয় রাধার কোনো উচ্চতর অবস্থান নয়। লোক-কবির কল্পনায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গভীরতা নিয়েও কিছু কৌতুকের কথা শোনা যায়। হুঁকো হাতে আগুন প্রত্যাশী কৃষ্ণের রাধার গৃহে গমনের কথাটি লঘু পরিহাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে রাধা কৃষ্ণের রূপটি নিতান্তই লৌকিক। প্রতিদিনের সংসারে যে কোনো আত্যন্তিক অনুভূতির প্রথম প্রবলতা কেটে গেলে তার আত্যন্তিকতা নিয়ে কৌতুক করার ব্যাপার ও দেখা যায়।

আমাদের ধারণা নটুয়া গানে একদিকে রাধার এই খেদ আর তার বিপরীত দিকে এই ধাঁধা হেঁয়ালি নিয়ে লঘুতরল পরিহাস প্রবণতা লোকজীবনের একটা বৈপরীত্য তুলে ধরে। রাধার কৃষ্ণ বিরহে ততটা মন না দিয়ে বরং কিছুটা হাল্কাভাবে সেই বেদনা উপস্থাপিত করা ও একটা শিল্প কৌশল। নটুয়া পালায় রাধাকৃষ্ণের লীলার নানা পর্যায়কে অবলম্বন করে তার মধ্যে এই লঘুচপল হাস্য পরিহাস প্রয়োগের এটা একটা কারণ হতে পারে। আমাদের সংগৃহীত পালায় পরিণতিতে দেখা যায় রাধা "পাশুরিমু মুই স্বামীর শোক" বলে রাধা তার দুঃখকে

সহ্য করে নিয়েছে। এই দুঃখ নিয়ে চিরকাল থাকা যায় না — দুঃখকে স্বীকার করেও জীবন এগিয়ে চলে — রাধার উক্তির মধ্যে সেই দিকটিই ফুটে উঠেছে। রাধা কদমতলে গিয়ে সায়ার শোক ভুলতে চায়। সেখানেইএর শেষ হতে পারে।এখানে কিন্তু শেষে উধব কৃষ্ণের ভাব নিয়ে রাধিকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। লোককবি এখানে কোন জীবনবোধকে প্রকাশ করেন তা স্পষ্ট নয়।

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক জীবন-যাপনের খন্ড চিত্রও এই নাটকের গানগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে উধব-মাধবের শ্লোকগুলোর মধ্যে চলমান জীবনের নানান কথা পাওয়া যায়। শ্লোকগুলোর মধ্যে দিয়ে জ্ঞানেরও উন্মেষ ঘটে। পুরুষানুক্রমে শ্রোতারা এগুলো গ্রহণ করে নিজেদের জীবনের কাজে লাগান।

'নটুয়া-বিরোগের গান' - লোকনাটক কোনো একজনের বিশেষ সৃষ্টি নয়। বহু লোক শিল্পীর সঙ্গীত-শৈলী দিয়ে তৈরী এই গানের পদগুলি। এগুলি শ্রুতি ও অভিনয়ের ভেতর দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতকে 'ভাওয়াইয়া' বলা হয়। এই ভাওয়াইয়ার বহু ধারা-উপধারা রয়েছে। দরিয়া, চটকা, ক্ষিরোল, দীঘল নাসা, মৈষালী, লাহাংকারী আরো নানা প্রকার রয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সংঙ্গীতের বিভিন্ন রকমের উপস্থাপন ঘটে। ভাওয়াইয়াতে দরিয়া বিভাগে নারীর বেদনা ও বিরহের কথা মুখ্যত প্রকাশ পায়। উত্তরের তরাই অঞ্চলে দরিয়া শব্দটির তেমন পরিচিতি পূর্বে ছিলো না। এখানে নারীর ব্যথা-বিরহ প্রকাশ হতো যে সুরে তা হলো লাহাংকারী। রাধিকার ব্যথা-বেদনা লাহাংকারী সুরের মধ্য দিয়ে পালানাটকে ব্যক্ত হয়।

'শাস্তরী' — পালাগান

জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই

'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' একটি 'শাস্তরী' লোকনাটক। এই লোকনাটকটিকে শাস্তরী বলার কারণ হচ্ছে, এই পালায় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর শাস্ত্রসম্মত তত্ত্ব কথার বিবরণ থাকে। অভিনয়ে মুখ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধ বেধে যায়। শাস্ত্রসম্মত তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিণতি ঘটে। রামায়ণ, মহাভারত, শিবপুরাণ, ভাগবত ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক কাহিনীর থেকে উদাহরণ সহযোগে পাত্র-পাত্রী যুক্তিস্থাপন করে একটি নির্দিষ্ট নীতিকে স্থাপন করেন এই নাটকে। জীবনবোধ, পার্থিব জগৎ, আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং অলৌকিক প্রেমের কথাও এই শাস্তরী পালাগানে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সারকথা প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' - নামের পালাগানে।

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে পাঁচালী গানের ব্যাপক প্রসার দেখা যায়। এই পাঁচালী গানের প্রকারভেদ তিন রকমের। খাস পাঁচালী, রং পাঁচালী এবং মান পাঁচালী। মান পাঁচালী পালাগানে কাহিনীর বিশেষ মান লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে মান পাঁচালী তৈরী। এই পালাগানে অনেকে শাস্ত্রীয় বিষয় লক্ষ করেন বলে মান পাঁচালীকে অনেকে শাস্তরী বলে থাকেন। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং নাট্যাভিনয়ের বিভিন্ন প্রদর্শন দেখার ফলে এটা পরিষ্কার যে 'শাস্তরী' গান মান পাঁচালী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

শাস্তরী গানে তত্ত্বকথাই মূল। তত্ত্বকথা শাস্ত্রীয় যুক্তির মধ্য দিয়ে স্থাপন করতে গিয়ে পাত্র-পাত্রীদের ঘিরে একটি ঘটনা বিবৃত হয়।

শাস্তরী পালা শিলিগুড়ি মহকুমার একটিয়াশাল গ্রাম এলাকায় প্রচলিত। পূর্বে এই এলাকাটি গ্রাম ছিল। ডাবগ্রাম, সাহুডাঙ্গী, একটিয়াশাল, শালুগাড়া ইত্যাদি জায়গাগুলো পুরোনো বৈকুণ্ঠপুরের অন্তর্ভুক্ত। শহরের অগ্রগতির ফলে শিলিগুড়ির ইস্টার্ণ বাইপাস অঞ্চল নগরায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তবু পুরোনো অধিবাসী রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ অন্যান্য লোক-উৎসবের সঙ্গে এই 'শাস্তরী' পালাগানকে জীবিত করে রেখেছেন।

জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের সর্বত্রই এই গানের প্রচলন আছে। এই পালাগানের মূল গায়ক শ্রদ্ধেয় পরমলাল রায়ের কাছ থেকে এই গানের বিষয়বস্তু পার্শ্ববর্তী এলাকা — যথাক্রমে জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ী, মানিকগঞ্জ, ফাঁসীদেওয়া, নক্সালবাড়ী ও মাটিগাড়া এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি কিছুদিন আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এই মানুষটি পুরোনো শিলিগুড়ি এলাকার ঘুঘুমালীর রথখোলাতে বসবাস করতেন। এখনো তাঁর বংশধররা বিদ্যমান। পরমলালের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য তৈরী হন। তাঁরাই বিভিন্ন জায়গায় এই পালাটির

অনুষ্ঠান করেন। হলদিবাড়ী ব্লকের বর্ধিষ্ণু গ্রাম মানিকগঞ্জ লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান। মানিকগঞ্জ পঞ্চায়েত এলাকার ডাকের কামাত গ্রামের বিষ'রু গোঁসাই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারী এবং বেসরকারী অনুষ্ঠানে এই পালা নাটকটি মঞ্চস্থ করে থাকেন।

বর্তমান আলোচনায় 'শাস্তরী' পালাগানটির মূলভূমি শিলিগুড়ি মহকুমার তরাই অঞ্চল। রাজগঞ্জ ব্লকের শিলিগুড়ি সংলগ্ন একটিয়াশালের অধিবাসী শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় দলপরিচালনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পালাগানটি ধরে রেখেছেন। তাঁর কাছে শোনা যায় সাহুডাঙ্গির কাছাকাছি আমবাড়ীতে বহুপূর্বে নরসিংহ রায় নামে এক ওস্তাদ ছিলেন। নরসিংহ ওস্তাদের কাছে শ্রদ্ধেয় পরমলাল রায় এই 'শাস্তরী' পালাগানটি শিক্ষা করেন। পরে ধীরে ধীরে উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের সর্বত্রই এই গানের সমধিক পরিচিতি ঘটতে থাকে।

তরাই অঞ্চলের একটিয়াশাল গ্রামের শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় বর্তমানে জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালা নাটকটি পরিচালনা করে আসছেন। পরমলালবাবুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর কাছে চলে আসে। জীবিত অবস্থায় পটপুটিয়া গোঁসাই-এর চরিত্রে পরমলালবাবু অভিনয় করতেন। জ্ঞানবালার ভূমিকায় দীর্ঘদিন নগেনবাবু স্ত্রীর বেশে অভিনয় করতেন। বর্তমানে নারীরাই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নগেনবাবু জ্ঞানবালা চরিত্রের বদলে মূল গীদাল ও পটপুটিয়া গোঁসাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। জ্ঞানবালার চরিত্রে কখনো মমতা রায় আবার কখনো পাতা রায় অভিনয় করে থাকেন। বাণেশ্বর রায় একজন দক্ষ শিল্পী। তিনি সাজেন বগুলা গোঁসাই। এই সকল লোকশিল্পীদের বাড়ি সাহুডাঙ্গী, একটিয়াশাল, রথখোলা হরিচরণপাড়া ও ফাড়াবাড়ী এলাকায়। এই পালাটিতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে যুক্ত থাকেন যথাক্রমে মন্মথ রায়, কলিন রায়, দেবেন রায়, সুভাষ রায় এবং কেপেরু রায়।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ মঞ্চে অভিনয়কালে চরিত্রানুযায়ী সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদই ব্যবহার করেন। সাজ-সজ্জায় বাহুল্য লক্ষ করা যায় না। জ্ঞানবালার পোষাকের মধ্যে চাকচিক্য আছে। বিধবা মানেই যে তাঁকে সাদা কাপড় পরতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। মেক-আপ অতি সাধারণ। উগ্রতার কোনো প্রকাশ নেই। নর্তকী দু'জনার মধ্যে বেশ রং-এর ব্যবহার আছে। আলতা, সিঁদুর, পাউডার ও বর্তমান মেক-আপ-এর দ্রব্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।

শুধুমাত্র বর্ষার কয়েকটি মাস ব্যতীত বছরের সারাটা সময় এই পালাটি গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থের ঘরে-বাইরে কিংবা কোনো 'ধাম' -এ (নির্দিষ্ট স্থানে) অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়া দশমীর পর থেকেই তরাই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকাকে অতিক্রম করে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরের নানান স্থানে এই লোকনাটক মানুষের

আনন্দ শিক্ষা ও জীবনবোধ বিকাশে ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হয়ে চলে।

'শাস্তরী — জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা অন্যান্য লোকনাটকের থেকে কিছুটা আলাদা। আসরে শ্রোতাদের মাঝখানে দৈর্ঘ্যে দশ হাত প্রস্থে দশ হাত করে সীমানা নির্দেশ করা হয়। এই সীমানার মধ্যে ডিম্বাকৃতির মতো নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে বাজনাদার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা থাকেন। এই নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যস্থলে বাজনাদাররা বসেন। খোলবাদক, দোতরাওয়ালা, বংশীবাদক, হারমোনিয়াময়ালা ও করতালবাদক ডিমের ভিতরের কুসুমের মতো নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করেন। এঁদেরকে ঘিরেই উপ-বৃত্তাকারে নাটকের চরিত্ররা অবস্থান করেন। চরিত্রগুলোর মধ্যে জ্ঞানবালা, পটপুটিয়া গোঁসাই, বগুলা গোঁসাই ও দু'জন নর্তকী থাকেন। আসরের ভেতর প্রায় বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে গীত, নৃত্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে এই 'শাস্তরী' গান চলতে থাকে। পটপুটিয়া গোঁসাই এর চরিত্রে অভিনয় করেন মূল গীদাল। পালার শুরুতে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম মূল গীদাল উপস্থিত করেন। শাস্ত্র-সম্মত ও অধ্যাত্ম বিষয় আলোচিত হয় বলে কিছু আচার-অনুষ্ঠান থাকে। বন্দনা শুরু হওয়ার আগে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কিছুক্ষণের জন্য পূজা-অনুষ্ঠান করা হয়।

পটপুটিয়া গোঁসাই নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজেন। তিনি বগুলা গোঁসাই-এর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবীয় জীবন-আচরণের প্রতি অনুরক্ত হন। গৃহস্থ জীবনের ভোগ-বাসনাকে সর্বদাই নিবৃত্ত করে ঈশ্বরের সাধন-পথে নিজেকে সমর্পিত করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। এমনি একদিন শিষ্য বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি হয়ে গেলে অপরিচিত একটি বাড়িতে হাজির হন। সেই বাড়িতে সদ্য বিধবা জ্ঞানবালা বাস করেন। অল্প বয়সের 'চিটুল বিধবা' জ্ঞানবালা নবীন। বয়সের সন্ন্যাসী পটপুটিয়াকে দেখে তাঁর হৃদয় বিচলিত হয়। অতিথিকে আপ্যায়ন করার জন্য জ্ঞানবালা সমস্তরকম ব্যবস্থা করেন। পটপুটিয়া গোঁসাই জ্ঞানবালাকে জানিয়ে দেন তিনি বৈষ্ণব। বিধবা নারীর আপ্যায়ন তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। গীত-সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রথমেই উভয়ের পরিচয় বিবৃত হয়। পটপুটিয়া গোঁসাই কী কারণে নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হন তাঁর পরিচয় দেন। জ্ঞানবালা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁর সাংসারিক জীবনের বাসনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই কথাগুলো গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। জ্ঞানবালা শাস্ত্রসম্মত যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন বিধবার দ্বারা সকল ক্রিয়াকর্মের শুদ্ধতা বজায় থাকে। পটপুটিয়া নানা যুক্তির অবতারণা করেও শেষে জ্ঞানবালার কাছে নতি স্বীকার করেন। এই ভাবে একটি ছোটো ঘটনাকে ঘিরে নানা শাস্ত্রকথা উভয়ের তর্কযুদ্ধের ভেতর দিয়ে উন্মোচিত হয়।

পূজা অনুষ্ঠানের পর মূল গীদাল বন্দনা শুরু করেন। বন্দনা অনুষ্ঠানটি অন্যান্য লোকনাটকের বন্দনা থেকে সামান্য আলাদা। কুষাণ, দোতরা, নটুয়া ও রাজধারী পালা নাটকে আসর বন্দনার সময় বিভিন্ন দেব-

দেবী, গিরি-পর্বতমালা, সাগর ও পীর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই পালাগানে কেবলমাত্র সতী নারীদেরই বন্দনা করা হয়। তাঁদের বন্দনার সময় পরিচিতিও সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, সীতা, রাধা, দ্রৌপদী, অহল্যা, রঞ্জনা, পদ্মাবতী ও বেহুলা - এই সকল সতী নারীদের বন্দনা করে নেওয়া হয়। বন্দনা গানের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

"লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দু মাগো
গঙ্গা ভাগীরথী
পাপের হবে মুক্তি।
সতীর মধ্যে সতীরে ভাই
নামটি তাহার সীতা
সেও সতীটাক হরণ করিছে
লঙ্কার রাবণ রাজা।
আরেক সতীক বন্দি নেবো
নামে রাধা সতী
সেও সতীটা হইছে ভাইরে
ভাগিনা ভাতারী"

উপরে যতো সতী নারীর কথা বলা হয়েছে এই ভাবে তাঁদের সকলের গানের মধ্য দিয়ে বন্দনা করা হয়। বন্দনার মধ্যে সকল নারীর পরিচিতি দেওয়া হয়। যেহেতু এই পালাটিতে বিধবা জ্ঞানবালার সতীত্ব ও নারী মর্যাদার প্রতিষ্ঠাই বড়ো হয়ে উঠেছে, তাই বন্দনা অংশে শুধুমাত্র সতী নারীদের কথাই বলা হয়। বন্দনা শেষ হলে মূল গীদাল পটপুটিয়া চরিত্রের ও নামের ব্যাখ্যা দেন। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে মূল গীদাল স্বয়ং আসরের মধ্যেই পটপুটিয়ারূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং পটপুটিয়ার চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। এই পালা নাটকে মূল গীদালের চরিত্রের বিশেষ কিছু ভূমিকা থাকে না। পটপুটিয়ার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলি নাটকীয় আকারে কথোপকথন ও গান-সংলাপের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত প্রতিভাসিত হতে থাকে।

বিধবা জ্ঞানবালা চরিত্রের সঙ্গে পটপুটিয়া গোঁসাই-এর শাস্ত্র সম্মত তর্ক যুদ্ধ গান ও কথার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। জ্ঞানবালার হাতের রন্ধনে কোনো প্রকার দোষ নাই — এই বিষয়বস্তুটি যুক্তি সহকারে জ্ঞানবালা তুলে ধরতে চান।

লক্ষ্য করা যেতে পারে —

জ্ঞানবালা ঃ (পটপুটিয়াকে উদ্দেশ্য করে) গলাত তোর তুলসি মালা
অহে আড়ি মাইয়া
রাধা হছে দুই ভাতারী
বোষ্টমের গোড়া।
ওই শোনেক ঠাকুর মন দিয়ে
আড়ি মাইয়া মহাশুদ্ধি
দেখো বর্তমানে।
তুলসী হছে আড়ি মাইয়া
সকল কাজে লাগে।
বিবাহিতা নারী একজন
নাম তার সীতা,
কোনো কাজে নাহি লাগে
কায় করে পূজা।
এক ভাতারী একেশ্বরী
নাই ভাতারী সাই,
পাঁচ ভাতারী হছে
ভগবানের পিসাই।

পটপুটিয়া ঃ পাঁচ ভাতারী কায়গে মাই
বাতায়ে দিবা হোরে,
নিশুনিম তোর মুখের কথা
কোন শাস্ত্রত আছে

জ্ঞানবালা ঃ পাঁচ ভাতারী কুন্তী দেবী
শ্রী কৃষ্ণের পিসাই,
এই কথাটা মিথ্যা না হয়
মহাভারতে পাই।

জ্ঞানবালা বিধবা হওয়া সত্ত্বেও যে তিনি বৈষ্ণবীয় কাজের সমান অধিকারী এই বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। শুধু যুক্তি নয়, কখনো কখনো এমন সকল মানবিক বিষয়কে উপস্থাপন করেন তখন সমগ্র নারী জাতির ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

বৈষ্ণবীয় আচরণের কঠোর-সাধন পটপুটিয়া গোঁসাই-এর মধ্যে শেষ-পর্যন্ত জ্ঞানবালার সংস্পর্শে নির্মল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যুগল প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথের কথা এই পালা নাটকের একটি বিশেষ দিক।

বিধবা নারীর প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, সাধনপথের সহায়িকারূপে নারীর ভূমিকা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত।

বৈষ্ণবতত্ত্বের ব্যাখ্যা উভয়েরই গীতময় কথোপকথনে পরিস্ফুট। এখানেও উল্লেখ করা যেতে পারে -

জ্ঞানবালা ঃ বোষ্টম হয়য়া যেবা নিন্দা করিছে আড়ি।
না জানে বোষ্টম তত্ত্ব পেটের বৈরাগী
আড়ি নিন্দা করেচিস এইটা তোর ভুল
আড়ি মেয়েটা হছে ভব নদীর কূল।
আড়ি নিন্দা করেছিত বোষ্টম গোঁসাই
আড়ি মাইয়ার জল না হলে ভাইন্ডের শুদ্ধি নাই।
জীবতো চলিয়া গেইছে ভাইন্ড আছে পড়ি
তুলসি জল দিলে ভাইন্ডের হবে শুদ্ধি
হুজুগেতে মাতিয়া সাজিছেন বৈরাগী
অল্প বয়সে ডোর কাটিয়া হইছেন বৈরাগী
হাঁড়ি ভাঙিলে খোলা শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ চাষে
নারী শুদ্ধ হামার চান্দে মাসে
পুরুষ শুদ্ধ কিসে?

পটপুটিয়া ঃ হাঁড়ি ভাঙিলে খোলা শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ চাষে
নারী শুদ্ধ চান্দে মাসে
পুরুষ শুদ্ধ গুরুর মহামন্ত্রে।
(আড়ি - অর্থ বিধবা)

নারীতত্ত্ব ঠিকমতো সাধন করতে না পারলে বৈষ্ণবতত্ত্ব উপলব্ধি করা সহজ নয়। জ্ঞানবালা এই মতকে যুক্তি সহকারে স্থাপন করেন।

জ্ঞানবালা ঃ নারী নিন্দা ওরে ঠাকুর
করেছিত কিতায়
নারী ছাড়া দেখগে ঠাকুর
আছে আরো কায়।

পটপুটিয়া ঃ মাইয়া হন ওগে মাই মাকড়ার জাল
নারী লোকগুলা হছেন তোমহা পুরুষের মহাকাল।

জ্ঞানবালা ঃ নারী নিন্দা কহছিস বোষ্টম গোঁসাই
নারী হইতে সৃষ্টি হইছে দুনিয়ায়

কথা ঃ ঠাকুর আগে সাধন করো নারী
নারী সাধন না করিলে না হও বোষ্টম বৈরাগী
না জানিলে নারীতত্ত্ব নারীতে যদি হস মত্ত
পুরুষের যে পরমাত্মা, সবে নিবে কাড়ি
তার আগে না হও বোষ্টম বৈরাগী।
ইর' পিঙ্গলা সুষম্না নারী থাকে যেন আজ্ঞাকারী
আগে সাধন করো নারী, তার আগে
না হও বৈষ্টম বৈরাগী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নারী শুধু লৌকিক জীবনের সাংসারিক বিষয়-আশয়ের বস্তু নয়। নারী সাধনার মধ্য দিয়ে অলৌকিক দিব্যলীলায় পৌছানো যেতে পারে। রাধাস্বরূপ নারী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি দিয়ে তৈরী। সেই নারীকে সাধন করা একান্ত দরকার। জ্ঞানবালার শাস্ত্রসম্মত কথায় পটপুটিয়া গোঁসাই-এর মন মুগ্ধ হতে থাকে। তিনি তাকে দীক্ষা দিয়ে পরম শিষ্যা তৈরী করতে চান।

পটপুটিয়া বলেন ঃ চন্দ্র গেলো সূর্যের কাছে
মিতিংগা গেলো জলে ভাসি
তোমাকে মন্ত্র দেবো
হৃদয়ে বসি।

জ্ঞানবালার কথা ঃ ঠাকুর মন্ত্র দিবেন, মন্ত্রটা কোন স্বরূপ?

পটপুটিয়া ঃ মন্ত্রটা শ্রীমতী রাধাস্বরূপ।

জ্ঞানবালা ঃ শ্রীমতী রাধা বেটি ছাওয়া না ব্যাটা ছাওয়া?

জ্ঞানবালার এই তাত্ত্বিক প্রশ্ন পটপুটিয়াকে গভীর বিস্ময়ে ফেলে দেয়। জ্ঞানবালার বৈধব্য এবং তিনি যে ঈশ্বর সাধনায় কোনোরকম অন্তরায় নন বরং যুগল সাধনের ক্ষেত্রে একান্ত সহযোগী হয়ে উঠতে পারেন - এই বোধে পটপুটিয়ার জীবনের উত্তরণ ঘটতে থাকে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকার কান্তাপ্রেমে সর্বস্ব নিবেদন করে পটপুটিয়া গোঁসাই ঈশ্বরের অলৌকিক প্রেমে প্রবেশ করতে চান। নানা প্রশ্নোত্তরে পটপুটিয়া গোঁসাইর নিজেকে সমর্পণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর নেই।

এই নাটকের শেষে গিয়ে মিলনের গান দেখা যায় ---

'যুগল সাধনের মতো
আর তো সাধন নাই
শাস্তর খুলিয়া দেখো
ওরে বোষ্টম গোঁসাই।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের নির্গলিত রসই ভক্তিরস। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা স্বরূপতঃ সত্য। তাঁদের যুগল মিলন পূর্ণ ঈশ্বরের প্রতীক। সুতরাং এই পালানাটকটি লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এইক্ষেত্রে লোকশিক্ষার ভূমিকায় যথেষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

প্রত্যেকটি লোকনাটকের মধ্যে সমকালীন জীবনের ছাপ পাওয়া যায়। জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালাটিকে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই একটি তৎকালীন সমাজ চিত্র।

পালার শুরুতে পটপুটিয়া-গোঁসাই-এর নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজার কারণ বর্ণিত হয়েছে। গৃহস্থ জীবনের মধ্যেও অনেকে গার্হস্থ্য জীবন সম্পূর্ণ শুরু না করে গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে ঈশ্বরের পথে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর কাছে সদ্য বিধবা জ্ঞানবালার পরিচয়ের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।

অল্পবয়সে বিয়ে এবং বিধবা হয়ে যাওয়া সে সময়ে সচরাচর দেখা যেতো। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বিধবাদের চাইতে বৃহৎ উত্তরবাংলার উত্তরাঞ্চলের বিধবা নারীদের স্বাধীনতা অনেক বেশী প্রতীয়মান। সামাজিক আচার-আচরণের নিয়ম-নিষ্ঠার ঘেরাটোপের মধ্য দিয়ে এই নারীরা কখনোই বিকশিত হননি। অন্যান্য পুরুষদের

সামাজিক ক্রিয়াকর্মের প্রায় সমান অংশীদার হতেন। পাশাপাশি বিধবা বিবাহ কোনোদিনই এই অঞ্চলের জনসমাজে নিষিদ্ধ ছিলো না। বিধবা নারীদের পুরুষদের বিভিন্ন উপায়ে বরণ করে নেওয়ার প্রথা পরিলক্ষিত হয়। লোকনাটক, ভাওয়াইয়া এবং লাহাংকারী গানের মধ্যে এর বিবরণ পাওয়া যায়। ভাওয়াইয়ার দরিয়া বিভাগে এবং লাহাংকারী গানে এই সকল নারীদের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোক সমাজে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। নারীপ্রধান সভ্যতার উপরে ক্রমে পুরুষ প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা হলেও নারীর মূল্য, সমাজ মোটের উপর স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কালক্রমে বাইরে থেকে অন্যকোনো পুরুষ প্রধান সমাজের প্রথা এই সমাজের উপর এসে পড়ে। যে তিনটি শাস্তরী লোকনাট্য আমরা দেখেছি ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সংকলিত মুকচাটু গঁসাইয়ের পালা ড. শিশির মজুমদার সংকলিত নয়ানশোরী এবং এখানে আলোচিত জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই — তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় — বৈষ্ণব শ্রেণীর কোনোব্যক্তির সঙ্গে তর্কালোচনায় নারীর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। বৈষ্ণব সমাজের কোনো গোস্বামীর সঙ্গে এইলোক সমাজের কোনো বিধবা নারীর তর্কের মাধ্যমে এই সমাজে নারীর এবং বিধবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখানোর অন্য তাৎপর্য পাওয়া যায়। এর সঙ্গে তর্ক যুদ্ধের প্রাচীন প্রথাটিও লক্ষণীয়। তিনটি ক্ষেত্রেই গোস্বামীর পরাজয় এবং জয়ী নারীকে তার ইচ্ছানুসারে বিবাহের কথা বলা হয়েছে। নারী লোকসমাজের প্রতিনিধি। 'গোস্বামী' উচ্চতর সমাজের। উচ্চতর তথাকথিত ভদ্রশ্রেণী সংস্কৃতি যখন লোকসমাজের উপরে আরোপিত হয়, তখন তার যে প্রকৃতি পরিবর্তন ঘটে তার কথা পাই গোস্বামীদের আচরণে। অন্যপক্ষে লোকসমাজের জীবন চিন্তাই শেষ পর্যন্তএ নাটকগুলিতে জয়যুক্ত হয়। জ্ঞানবালা পটপুটিয়া গোঁসাই পালাগানে জ্ঞানবালার ভূমিকা এই দিক থেকে সৃষ্ট। বাইরের থেকে আরোপিত কোনো বস্তুর উপর নির্ভর করে রচিত ও প্রদর্শিত নয় এই পালাগান। বাংলা লোকনাটকের ইতিহাসে এরূপ নারীচরিত্রের প্রকাশ বিরল। পালানাটকটি গীত, নৃত্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে চলে এই কথা আগেই বলা হয়েছে।

পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের বক্তব্য অধিকাংশ সময়েই গীতের মধ্য দিয়ে ঘটে। বিষয়টিকে দর্শক শ্রোতাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে এই ব্যবস্থা। দর্শকের মনে রসের সঞ্চারের জন্য যেমন গীতের ব্যবহার ঠিক তেমনি কথারও ব্যবহার, রয়েছে। আর এই গীত বা সংলাপের ভাষা অধিকাংশ সময়েই আঞ্চলিক। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

বগুলা গোঁসাই ঃ বাউ তুই কায় ?

পটপুটিয়া ঃ মুই ক্যাছেরার ব্যাটা/ছেরাদ্দের সময় গেসিলেন।

বগুলা ঃ যাবেন তোমরা কুন্তি ?

পটপুটিয়া ঃ বড়ই দুঃখে গোঁসাই
আসিলাম তোমার বাড়ী।

বগুলা ঃ কি তায় আসিলেন বা?

পটপুটিয়া ঃ বড়ই দুঃখে আসিচু গোঁসাই।

গান ঃ দিনু গুরু দায়

ধন সম্পত্তি ফুরায়ে যায়া,

মুই মানষের ভিতর নাই।

দেও মোক ঝোলা মালা,

দেও গোপাল ডাং,

দ্যাশ বিদেশে মুই ভিক্ষা করিয়া খাম।

সংলাপ কিছু সময় ধরে চলতে থাকলে গান শুরু হয়ে যায়। লোকনাটকের গান শুধু মাত্র গানের জন্য নয়। গানের ভিতর দিয়ে রসসঞ্চার যেমন হয়, তেমনি সংলাপের কাজটিও সেরে নেওয়া হয়। এই গানে উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়ার দরিয়া ও লাহাংকারী গানের সুরের প্রভাব বিদ্যমান। এই এলাকায় মনোশিক্ষা বা দেহতত্ত্বের গানের পরিচিতি ব্যাপক। এই মনোশিক্ষা বা দেহতত্ত্ব গানে অধ্যাত্মকথা, পৃথিবীর নশ্বরতা, পরলোকের বিষয় মুখ্য হয়ে ওঠে। এই সকল শাস্ত্রসম্মত গানগুলোর বিশেষ অংশ এই লোকনাটকে গীত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ করা যায় — ওই মন মাতঙ্গ বান্ধব

সদায় মন মোর আনন্দ

গুরু বলিয়া ডাকরে মন

এ দেহটা নিশির স্বপন।

'শাস্তরী' গান বলে শুধু শাস্ত্রসম্মত কথাই থাকে না। নাটক যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই এখানে তৎকালীন বিধবা নারীর স্বামীবিহীন যন্ত্রণাও ক্রন্দনে ফুটে উঠেছে।

জ্ঞানবালার গীত ঃ ছোটয় ছিনু ভালো ছিনু

বাপ মায়ের কোলে।

বেহা হয়য়া হনু আড়ি

নিজ কর্মের দোষে।

বেশী বয়সের পুরুষের সঙ্গে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিয়ের প্রচলন ছিলো। বাল্যকালে বাবা-মায়ের কাছে আদর যত্নের কোনো অভাব ছিলো না। কিন্তু স্বামীহীনা হওয়ার পর তাঁর দুঃখের আর শেষ থাকে না। গোটা লোকনাটকটি ঘিরে রয়েছে সমকালীন সমাজ জীবনের চিত্র। এই আলোচনার সঙ্গে সংযোজিত লোকনাটকটি অনুধাবন করলে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হবে।

রাজধারী

রাজধারী তরাই অঞ্চলের একটি অনাবিষ্কৃত লোকনাটক। এ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি নিয়ে লেখা গ্রন্থে রাজধারীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচন করেছেন। রাজধারী তাঁর এলাকার মধ্যে পড়ে নি। পরবর্তীকালে লোকনাট্যের যেসব সংকলন গ্রন্থ বা আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির কোনোটিতে রাজধারী সম্বন্ধে কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। কাজেই বলা যেতে পারে রাজধারী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। এই রাজধারী অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি নাট্যরূপ। নাট্যবৈচিত্রের কারণে এবং লোকনাট্যের রূপায়ণের বিশেষত্বের দিক থেকে রাজধারীর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। উত্তরবাংলার দীর্ঘকালের সংহত সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এই এলাকার লোকনাটকগুলি। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নেমে এসে সমতলে মিশেগেছে তরাই অঞ্চল। বনানী, চা বাগিচার ঘন রাশি, নানান ছোটো ছোটো পাহাড়ী নদী, উঁচু-নীচু চাষের জমি দিয়ে ঘেরা তরাই। এর জনপদগুলো কালোক্রমে নাগরিক জীবনের প্রভাবে আধুনিক হয়ে উঠছে। এই জনপদগুলোর মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বৈষ্ণবতার ভাবে ভাবিত তাঁদের জীবন। বৈষ্ণবীয় জীবন চর্যা তাদের প্রতিদিনের নিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনকে করে তুলেছে সংযমী এবং ভক্তি ভাবময়। ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর নিয়ম এখানে তেমন একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ সহজ জীবন চেতনার সঙ্গে বৈষ্ণবতাকে মিলিয়ে জীবনে একটা নৈতিকতা এবং সহজধর্ম বজায় রাখতে পেরেছেন। সেই জন্য এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতিতে বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

রাজধারী এখানকার প্রাচীন লোকনাটক। মনে করা যায় গানের মধ্যে অভিনয় যুক্ত হয়ে অন্যান্য লোকনাট্যের মতো এরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এর বিষয় রামায়ণ থেকে নেওয়া। রামের সঙ্গে রাবণের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত রামের কাছে রাবণের আত্মসমর্পণের কাহিনী এই নাটকের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। রাজধারী দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের নাটক শিলিগুড়ির গ্রামাঞ্চলে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে এবং উত্তর দিনাজপুরের কোন কোন অঞ্চলে এর প্রচলন আছে। এই অঞ্চল সন্নিহিত বিহারের কিষাণগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ এবং নেপালের তরাই অঞ্চলের ঝাপা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাজধারী লোকনাটকের প্রসার দেখা যায়। এই নাটকের পরিবেশন, উপস্থাপন পদ্ধতি, ভাষা, পোশাক ও মুখোশের ব্যবহার, ইন্দ্রজাল সৃষ্টি, শ্রোতাদের সঙ্গে নিবিড় মিলন, মঞ্চ ও রাবণের সিংহাসন পরিকল্পনা প্রায় সমস্ত কিছুতে একটা নতুনত্বের দাবী রাখে।

'রাজধারী' নাটকের আর একটি নাম লংকার গান। রামচন্দ্রের সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বন গমন থেকে লংকায় সীতা উদ্ধার পর্যন্ত 'রাজধারী' গানের বিষয়। লংকাকাণ্ডের বিষয় এর আখ্যানের প্রায় মূল ঘটনা। তাই

একে লংকাগান বলা হয়ে থাকে। এই নাটকের চরিত্রগুলির পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবহার রাজকীয়। লঙ্কার রাজা রাবণকে নিয়ে এই গান পরিবেশিত হয়। রাবণের রাজকীয় আড়ম্বর এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। তাই এই নাটককে 'রাজধারী' বলা হয়ে থাকে। 'রাজধারী' নামটি সম্বন্ধে আর একটি অনুমান করা যায়। এই নাটকের বিষয় রাবণের রাজ-মহিমা, রাজশক্তির অহংকার এবং দম্ভের প্রকাশ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রাজমহিমা বনবাসী রামের চরণে বিসর্জিত হয়। রাবণের শক্তির দম্ভ ভেঙে যায়। রামের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। তখন মনে হয় রামই প্রকৃত 'রাজা' আর রাজা পদবীধারী রাবণ কেবল 'রাজবেশধারী। তার অহংকৃত রূপ ভেঙে পড়ে। তাই রাবণ রাজবেশধারী বা 'রাজধারী' মাত্র। রাবণের কাহিনী এবং রামের কাছে তার আত্মসমর্পণ ও রামের আশ্রয়লাভ এই নাটকের মূল বিষয় বলে এর নাম 'রাজধারী' — এমনটা হতে পারে।

'রাজধারী' নাটকের উপস্থাপনা ঃ

এই নাটক কারো বাড়ীতে হয় না। কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় অথবা প্রয়োজন মতো স্থান নির্বাচন করে এই নাটক প্রদর্শিত হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির বাইরে অথচ এমন স্থান যেখানে বাড়ীর মহিলারাও অনায়াসে আসতে পারেন। অবশ্য মহিলারা বর্তমানে যে কোনো মুক্ত মঞ্চের অনুষ্ঠানই দেখতে আসছেন। শ্রোতাদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা পুরুষদের প্রায় কাছাকাছি। এই নাটকের স্থাননির্বাচনের সঙ্গে মঞ্চ পরিকল্পনা যুক্ত থাকে। প্রায় ২০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া বর্গাকার ক্ষেত্র আসর হিসাবে ব্যবহার করা হয় একটি জায়গা নির্বাচন করার পর সেই স্থানে রাবণের সিংহাসন তৈরী করা হয়। বাঁশ দিয়ে তৈরী এই সিংহাসনে পৌঁছতে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। রাবণের পদাধিকারগত উচ্চতাকে প্রকাশ করার জন্য এই ব্যবস্থা। এই মঞ্চসজ্জাকে লোকভাষায় বলা হয়ে থাকে 'লংকা বান্ধা'। এটি লংকার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রাচীন লোকনাট্যের ইতিহাসে খোলা মঞ্চের ব্যবহার ধারাবাহিক ভাবে দেখা যায়। এই মঞ্চের উত্তর-পূর্ব কোণায় বাঁশ দিয়ে একটি ঘরের মতো আচ্ছাদন তৈরী করা থাকে। এটিকে অশোকবন রূপে চিহ্নিত করা হয়। এখানে রাম-লক্ষ্মণ আশ্রয় নেয়। মঞ্চের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে শ্রোতাদের বসার জায়গা। দক্ষিণদিকে শিল্পীদের জন্য খোলা প্রাঙ্গণ।

মঞ্চে শিল্পীদের ব্যবহৃত মূল বাদ্যযন্ত্রগুলি হলো খোল, ঢুলকি, ডুগি-তবলা, কাড়ানাকাড়া, বাঁশি ও করতাল। এই যন্ত্রগুলোর অধিকাংশই শিল্পীদের নিজেদের তৈরী। বাজনাদাররা শুধু বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করেন না, তাঁরা অভিনয়ের বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে কখনো লিপ্ত হয়ে যান। তবে তাঁদের যন্ত্রসঙ্গীতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বাদ্যযন্ত্রীরা এই নাটকে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য নাটকের মতো আসরের মাঝখানে বসেন না। মঞ্চের একদিকে বসেন। রঙ্গমঞ্চে যাওয়ার জন্য একটি সরু পথ থাকে। অন্য দিকে থাকে লংকার সিংহাসন। এইরূপ মঞ্চ পরিকল্পনা বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের লোকনাটকের মঞ্চ থেকে আলাদা।

অভিনয়ে শিল্পীদের বিশালাকার মুখোশের ব্যবহার লক্ষণীয়। মুখোশের ব্যবহার বাংলার লোকনাটকে নতুন নয়। দিনাজপুরের ব-খেলা কিংবা পুরুলিয়ার ছৌ-এ মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু রাজধারী লোকনাটকে লংকায় বসবাসকারী চরিত্রগুলোর মধ্যে বড় বড় মুখোশের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রে মুখোশের কোনো ব্যবহার নেই। তারা ধুতি-পাঞ্জাবী পরেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিপরীতদিকে লংকাবাসীদের চরিত্রের কর্কশভাব ও ভয়ংকরতা ফুটিয়ে তোলার জন্য এই সকল মুখোশের ব্যবহার করা হয়। রাম লক্ষ্মণের মধ্যে বীরভাব অপেক্ষা বৈষ্ণব ভাবই প্রধান। রাবণের মুখোশ বিশাল আকৃতির। দেড় ফুট চওড়া এবং আড়াই ফুট লম্বা। ওজনের দিক থেকে কম পক্ষে ৭-৮ কিলোগ্রাম। গামারি, শিশু বা সেগুন কাঠের তৈরী এই মুখোশ। একবার এই মুখোশ তৈরী হলে তা দীর্ঘদিন সযত্নে রাখা হয়। রাবণের মুখোশের দুপাশে দেড়ফুট লম্বাকারে আরো দুটো মুখোশ থাকে। মুখোশের উপরিভাগ বরাবর ছোটো ছোটো কাঠের তৈরী দশমুন্ড। সব মিলিয়ে ১৮ থেকে ২০ কিলোগ্রাম ওজন এই মুখোশটির। এই মুখোশ পরে রাবণকে মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে অভিনয়ের জন্য চলাফেরা করতে হয়। কুম্ভকর্ণের মুখোশও বিশালাকৃতির। দেড়ফুট চওড়া, দু' ফুট লম্বা, ওজন ৮ থেকে ১০ কিলোগ্রাম। কুম্ভকর্ণের মুখোশের মধ্যে ভয়ংকরতার চেয়ে নিদ্রালুতার ভাব বেশী। উর্মিলার মুখোশ ১ ফুট চওড়া ২ ফুট লম্বা। মহীরাবণের মুখোশও বেশ বড়ো আকৃতির। এক ফুট চওড়া আড়াইফুট লম্বা। মুখোশের দুদিকে দুটি ছোটো মাথা লাগানো অতিরিক্ত মুখোশ আছে। মুখোশ দুটির একসঙ্গে ওজন প্রায় ১০ কিলোগ্রাম। মুখোশগুলির বেশীর ভাগই উজ্জ্বল বেগুণী রঙের। মহীরাবণের মুখোশের মধ্যে একটা চাতুর্যের ভাব আছে। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের মুখোশ এক ফুট চওড়া, দু' ফুট লম্বা। এই মুখোশটিরও ওজন প্রায় ১০ কিলোগ্রাম। ইন্দ্রজিতের মুখোশের মধ্যে ভয়ংকরতার চেয়ে শৌর্যের ভাব বেশি। সেখানে একটা রাজকীয়তার ভাব পরিস্ফুট হয়। রাবণভগ্নী সূর্পনখার মুখোশ দুটি। একটি খয়েরি রঙের আর একটি সাদা। মুখোশ দুটি এক ফুট চওড়া দু' ফুট লম্বা। সিপাইরা যে মুখোশের ব্যবহার করে সেগুলো দেড় ফুট চওড়া, দুই ফুট লম্বা; এগুলোর রং খয়েরি। হনুমানের মুখোশ এক ফুট চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা। এই মুখোশের রং লাল। জাম্বুবানের ক্ষেত্রেও এক ফুট চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা কিন্তু এক্ষেত্রে মুখোশের রং কালো। আরো কয়েক প্রকার মুখোশ থাকে - লাল, নীল, এবং সাদা রঙের। এগুলো বানরের মুখোশ। একটি বৃহৎ আকারে বাঘের মুখোশ থাকবে। একটি গড়ুর পাখীর বৃহৎ আকারের ঠোঁট দেখা যায়। সেটি লম্বায় ৩ ফুট হবে। দেবী দুর্গার একটি ভূমিকা এই নাটকে আছে। দেবী দুর্গার দশ হাতের পরিবর্তে এখানে আটটি হাত দেখানো হয়। হাতগুলিতে ত্রিশূল, গদা, ও ধনুক দেখা যায়। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মুখোশের ব্যবহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং লোকনাট্যের পালায় দেখা যায়।

নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থে কোনো কোনো লোকনাট্যের অনুষ্ঠানে মুখোশের ব্যবহারের কথা বলেছেন। গম্ভীরা লোকনাট্যে মুখোশের ব্যবহার আছে। নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন— পৌরাণিক যুগের কোনো মানুষ বা প্রাণীর মুখোশ ধারণ করিলে সেই যুগেরও সময়ের ভাব দর্শক ও ধারয়িতার মনে সঞ্চরিত হয়।"[৪৫] সম্ভবত এই প্রাচীন যুগের ভাবমণ্ডল সৃষ্টির কারণে রাজধারী লোকনাট্যে এরকম মুখোশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিল্পীরা চরিত্রানুযায়ী পোশাক ব্যবহার করেন। পোশাক বেশ উজ্জ্বল এবং রাজকীয় আড়ম্বর প্রকাশের উপযোগী। মেকআপ-এর জন্য জল, আলতা, সিঁদুর, আবীর, অভ্র ব্যবহৃত হয়। পরচুলার ব্যবহার প্রয়োজন মত হয়ে থাকে। এখানে যে মুখোশের ব্যবহারের কথা বলা হলো সেই মুখোশগুলো পুরুলিয়ার ছৌ-এর মুখোশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রাজধারী নাটকে রাম-লক্ষ্মণের কোনো প্রকার মুখোশের ব্যবহার নেই। পুরুলিয়ার ছৌ-এ প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখোশ ব্যবহার আবশ্যক।

'রাজধারী' নাটকটি মঞ্চস্থ করবার জন্য বাদ্যযন্ত্রী সহ ৬৫ থেকে ৭০ জন শিল্পীর দরকার হয়। এত বেশী সংখ্যক মানুষকে বর্তমানে একই সময়ে পাওয়া সম্ভব হয় না। সেই কারণে প্রায় ৩০ জন শিল্পী এই নাটকে অভিনয় করেন। বর্তমান যে নাট্যদলটি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ী এলাকায় এ নাটকের উপস্থাপনা করে সেখানে ১৮ জন শিল্পী ৫৮টি চরিত্র রূপায়িত করেন। কখনো এক একটি চরিত্র ৬ থেকে ৮ টি চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় চরিত্র বদলের সময় পূর্ব চরিত্রের ছাপ সেই চরিত্রে প্রতিফলিত হয় না। বিশাল বিশাল মুখোশ অতি দ্রুত বদল করে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে এঁরা অভিনয় করেন। স্বর বদলের ক্ষেত্রেও কোনো অসংগতি পরিলক্ষিত হয় না।

ইন্দ্ররাজা, খর, বিরাট, সিপাই, ব্রহ্মা, ইন্দ্রজিৎ, কালনেমি এবং বালি চরিত্রে অভিনয় করেন ডমন লাল সিংহ। আটটি চরিত্রে বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তি যথাযথ ভাবে সংলাপ বলে যেতে পারেন। শিব, হনুমান ও সূর্পনখা চরিত্রে অভিনয় করছেন শচীন রায় সিংহ। পুরুষ চরিত্র ও স্ত্রী চরিত্র একই ব্যক্তি করছেন। স্বরবদলের ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা হয় না। দূষণ, তরণীসেন, ইন্দ্রজিৎ, সূর্যদেব, মহীরাবণ এবং যোগীরাবণ চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন ভবানন্দ সিংহ। ছয়টি চরিত্রে ভবানন্দ সিংহের অভিনয় করতে কোনো অসুবিধে হয়না। গহন সিংহকে সৈন্য ও বানরের ভূমিকায় দেখা যায়। চারটি চরিত্র যথাক্রমে মুনি, তিরসিরা, অঙ্গদ ও চেরী একজন অভিনেতা সেরকেত সিংহের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়। সুপেন সিংহ মুনি, বিষ্ণু ও মারীচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সরস্বতী, বানর, অঙ্গদ ও মহীরাবণের ছেলের অভিনয় করেন রঞ্জিত মালাকার। দুর্গা, বিদ্যুতজিহ্বা, মন্দোদরী, গন্ধকালী ও পাতাল কালী এই পাঁচটি চরিত্রে বলেন সিংহ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। দেবেন মালাকার শুধু অভিনয়ই করেন না, নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তিনি

একাই তারাদেবী, সরমা, সূর্পনখা, সৈন্য, ত্রিজটা মুনি ও কৌশল্যা প্রভৃতি সাতটি ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। রাজু মালাকার ছেলেটি ছোটোখাটো এবং হাল্কা শরীরের, দেখতে সুন্দর। গলার স্বরটিও মিষ্টি। রাজু অভিনয় করেন লক্ষ্মী ও সীতার ভূমিকায়। অসুর ও বিভীষণের ভূমিকায় ধীরেন মালাকার, গণেশ ও রামচন্দ্রের ভূমিকায় শতো মালাকার অভিনয় করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মুনিদের ভূমিকায় কোনো মুখোশের ব্যবহার নেই। সেক্ষেত্রে এই অভিনয় যারা করেন তাদের শরীরের গঠন ও রঙের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। শত মালাকার দেখতে সুন্দর। তিনি রামচন্দ্রের অভিনয় করেন। হুদুম বর্মন কার্ত্তিক ও লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করেন। অনিল মালাকার সুন্দরী যুবতী ও গৌতম মালাকার হরিণ রূপে মঞ্চে আসেন। কিরণ সিংহ, ব্রহ্মা, সুগ্রীব ও রাবণের ভূমিকায় দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে যারা যুক্ত থাকেন তাদের মধ্যে শশীলাল সিংহ, সমু সিংহ, নিখিল পাল, বীরেন সিংহ, চিত্র বর্মন এবং উমাকান্ত সিংহ যথাক্রমে বাঁশি, হারমোনিয়াম, খোল, করতাল, ফ্লুট বাজান। গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে কালিয়া বর্মন, গহন সিংহ, রমণীকান্ত সিংহ, সমু সিংহ, পরবাসু বর্মন। সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বসনলাল সিংহ। বসনলাল পুরুষানুক্রমে এই পালাটির অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বহু সংখ্যক মানুষকে একটা দলের মধ্য টেনে এনে দলকে ধরে রাখা বেশ কঠিন। তাকে যথেষ্ট সতর্কতায় কাজ করতে হয়। রমেশ মালাকার সহপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

এই নাটকে রাবণের উচ্চ সিংহাসন তৈরীর একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। সহপরিচালককেই 'লঙ্কা বান্ধা' অর্থাৎ সিংহাসন তৈরীর ব্যাপারটি ঠিক করে নিতে হয়। এই নাট্য দলটির সাজ সজ্জার দায়িত্বে থাকেন বিদেশী বর্মন। নাট্যদলের লোকের কাছে তিনি সাজার লোক হিসাবে পরিচিত। এই শিল্পীরা গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। তাদের অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। কৃষক, সম্পন্ন গৃহস্থ, ক্ষেত মজুর, গ্রামীণ শিল্পী, চাকুরে, প্রাথমিক শিক্ষক ইত্যাদি পেশায় তারা যুক্ত। কেউ কেউ শহরে বা পার্শ্ববর্তী নেপালে গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা দলনেতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। যে কোনো সময়ে তাদের ডাক আসতে পারে। এই সকল গুণী মানুষরা প্রায় সবাই রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অঞ্চলের রাজবংশীগণের ধর্মীয় ভাবনা এই লোকনাটকের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নাটকের পর্যালোচনা ঃ

এবার আমরা রাজধারী গানের বিষয়বস্তুর ভেতরে প্রবেশ করবো। অনুষ্ঠান শুরুতে মঞ্চে মূল গায়ক সহ সাতজন বাদ্যযন্ত্রী প্রবেশ করেন। তাঁরা মঞ্চের একদিকে বসেন। অন্যান্য পালাগানের মতো মঞ্চের মাঝখানে আসন গ্রহণ করেন না। লংকার সিংহাসন যে দিকে থাকে তার কাছাকাছি শিল্পীরা বসেন।

মূল গায়ক রামলক্ষ্মণ বন্দনা দিয়ে গান শুরু করেন —

একবার দয়া করে আয় হে
একবার কৌশল্যার নন্দন হে প্রভু
রাম আয় হে
একবার সুমিত্রার নন্দন লক্ষ্মণ বীর
আয় হে
একবার কৈকেয়ীর নন্দন হে
ভরত-শত্রুঘ্ন আয় হে
একবার ব্রহ্মার নন্দন হে
জাম্বুবান আয় হে
একবার পবনের নন্দন হে
হনুমান আয় হে
একবার কিসকিন্ধ্যা নগরের হে
বালি-সুগ্রীব আয় হে
একবার বালীর নন্দন হে
অঙ্গদ বীর আয় হে

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বন্দনাও করা হয়।

একবার সোনার বরণ গৌর চান
কোথায় গেলে পাবো রে
ওই আমি আর না হেরিবোরে
হরি নাম সংকীর্তন প্রচার করিলোরে
গৌর ঐ আমি আর না হেরিবোরে

এরপর আবার রামচন্দ্রকে বন্দনা করে অন্যান্যদের বন্দনা —

ওহে রাম বন্দুবন্দু রামের যুগলচরণ
হে রাম বন্দু
ওই যে ভকতি করে বন্দি মাতা
কৌশল্যার চরণ হে রাম

এইভাবে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নসহ রামচন্দ্রের সপক্ষে যারা রয়েছে তাদের সকলকে বন্দনা করে নাটকের

মূলে প্রবেশ করেন গায়ক।

এই নাটকে বন্দনা অংশ শেষ হওয়ার পরই 'ডাক' বলে একটি বিশেষ পর্ব রয়েছে। এই 'ডাক' পর্বটি তুলসীদাসের রামায়ণে 'দোহা-' রূপে দেখা যায়। 'ডাক' এর উদাহরণ —

(ক) অযুতা কান্ডতে হইলো শ্রীরামের বন।
অরণ্য কান্ডতে সীতাকে হরিছে রাবণ।।

(খ) কিসকিন্দা কান্ডতে হইলো সুগ্রীব মিলন।
সুন্দরা কান্ডতে রাম বান্ধিলো সাগর।।

(গ) সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য কলে পার।
দিনে দিনে রাবণ রাজার টুটে অহংকার।

(ঘ) সর্বনাখার ময়া নিলা কে চিনিতে পারে।
রাইক্কস মূর্ত্তি ছাড়িয়া যেন সুন্দর মূর্ত্তি ধরে।।

বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গায়করা অথবা অভিনয়কালীন কোনো চরিত্র চিৎকার করে ঐ 'ডাক'গুলি দিয়ে থাকেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই নাটকীয় ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে। 'ডাক'গুলি শুধু আহ্বানই নয় এর মধ্যে কাব্যগুণও রয়েছে।

যেমন — বিরাট বীর মারা পইরে অরণ শব্দ হইলো।
গৃহ হইতে উর্মিলা বীর সাজনি করিলো।

উল্লেখিত 'ডাক'-এ পাই বিরাট বীর মারা গিয়েছে, অরণ্যে শব্দ হচ্ছে। বাড়ী থেকে উর্মিলা বীর যুদ্ধের জন্য সাজতে লাগলো। ঘটনার ক্রমবিকাশ এবং পরস্পরিক সংলগ্নতা 'ডাক'-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

রাজধারী লোকনাট্যের বিষয় রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে বহু গান পালা লোকনাট্যের রূপায়ণ হয়েছে। এই রাজধারী লোকনাট্যে লোককবি প্রায় পুরো কাহিনীকেই অল্প সময়ে উপস্থাপিত করেছেন। কাহিনী লঙ্কার রাবণের দিক থেকে দেখানো। বন্দনা গানের পরে দুই মুনির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্য পালার সূচনা। পালার সূচনায় চরিত্রের পরিচয় দেবার প্রয়োজন। লোকপালায় কথা থেকে আর সাজপোষাক থেকে দর্শকরা এই চরিত্রগুলিকে বুঝে নিতে পারেন। এই পালায় দুই মুনি মঞ্চে এসে পরস্পরকে পরিচয় জিজ্ঞেস করেন।

প্রথম মুনি ঃ ওরে মুনি হে, তুমি কুন মুনি হে

দ্বিতীয় মুনি : আমি অগস্ত্য মুনি হে, আরে তুমি কুন মুনি হে

প্রথম : আমি বিবর্ণ মুনি হে

এই ভাবে দুই মুনির পরিচয় দেওয়া হলে। তাদের কথার মধ্যে এলেন ইন্দ্ররাজ। তিনি এই মুনিদের প্রণাম করলেন। বিবর্ণ মুনি বললেন —

ওরে বাপু ইন্দ্ররাজ শুনহ বচন,

এখানে আসিলে বাপু কিসের কারণ ?

এইভাবে মুনির কথায় ইন্দ্রের পরিচয় পাওয়া গেলো। ইন্দ্র জানিয়ে গেলেন রাম আসবেন। তাঁর জন্য তিনি ধনুর্বাণ এনেছেন। সেগুলি যেন রাম লক্ষ্মণকে দেওয়া হয়। ইন্দ্র চলে যাবার পর এলেন রাম লক্ষ্মণ সীতা। এই তিনজনকে দেখে দর্শক এদের পরিচয় বুঝতে পারেন। উপরন্তু সংলাপে আসে পরিচয় দেবার কথা। রামের গানে তার প্রকাশ —

ওরে ভাইরে লক্ষ্মণ

রাইজ্য নাশি বনরে বাসীহে সঙ্গে সীতা ভাইরে

এইভাবে রামের পরিচয় পাওয়া গেল। এরপর মুনির পরিচয় জিজ্ঞাসা —

ওরে বাপু ছাইলারে তিনজন,

কথাকার বসন্তি কাহার নন্দন।

কিসের জন্য ফির বাপু পঞ্চবটী বনরে ?

রামের পরিচয় দান —

ওকি ও মুনি ঠাকুর, শুন মুনি ঠাকুর

ওহে অযুতার বসন্তি হামেরা দশরথ নন্দন

পিতার সত্যপালিতে দুই ভাই ফিরি বনে বন।

মুনিরা রাম লক্ষ্মণকে রাক্ষসের মায়া সম্বন্ধে সতর্ক করে নিজেদের তপস্যা যে সার্থক হল তা জানিয়ে চলে যান। গায়কেরা হরিধ্বনি দেয় — সর্বলোকে হরি বল রে। এই পর্যন্ত হল নাটকের উপস্থাপনা। পরবর্তী অংশে আসে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে আরণ্য রাক্ষসদের যুদ্ধ। প্রথমে বিরাট ও পরে উর্মিলা রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের বর্ণনা একই রকম।

বিরাটের প্রবেশ ও সীতা হরণ (রামায়ণে এর নাম বিরাধ)

রাম — ওকি ও ভাইরে লক্ষ্মণ, হের আসে দেখ আমার সীতার দুর্গতি রে ভাই।

লক্ষ্মণ — ওরে বেটা রাইক্কস দুরাচার,

শিরাম মানুষ না হয় ত্রিজগতের নাথ।

রাইক্কস বধিবা হেতু হয়েছে প্রকাশ।।

যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি ধর।

আজিকার রণে বেটা তোক পাঠাব যমের ঘর।।

যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিরাটের মুণ্ড কেটে ফেলল। এরপর এল ঊর্মিলা বীর। একই ভাবে সেও যুদ্ধে মারা যায়। যুদ্ধের বর্ণনা গায়েনের গানে —

ও বীর যুদ্ধ করে রে।

প্রথমে যে হইলো বীরের মোর মুখতে গালাগালি,

ও বীর যুদ্ধ করে রে।

দুইজনকার ভরে যেন মোর কাঁপেছে মেদিনী, ও বীর যুদ্ধ করে রে।

যুদ্ধে ঊর্মিলার মুণ্ড কেটে ফেলল লক্ষ্মণ। এরপর ডাকের গানে কাহিনীর যোজনা।

ডাক — ঊর্মিলাক মারিয়া প্রভু আনন্দ হইলো।

ঘোটনা বান্ধিতে প্রভু নিজে আইগা দিলো।।

ডাকের কথাতেই আমরা জানতে পারলাম —

ঘোটনা বান্ধিয়া প্রভু ঘোটে প্রবেশিলো।

মানব মানব বসন তবে সৌরভ ছুটিলো।।

ওরে মানব সৌরভ পায়া - রাইকসিনী আইলো ধায়ারে —

সূর্পনখা সুন্দরী রূপ ধারণ করে রামের কাছে যায়, রাম তাকে লক্ষ্মণের কাছে পাঠান। লক্ষ্মণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ডাকের গানে তখন জানতে পারি — সূর্পনখা রাক্ষসমূর্তি ধরে সীতাকে ভয় দেখায়।

লক্ষ্মণ — গে রাইক্কসনী গে রাইক্কসনী

কুন মুখে খাবো সীতাক দেখ্ তোর জিহ্বার পুতনী, গে রাইক্কসনী

লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাক কান কেটে নেন। সূর্পনখার ডাকে যুদ্ধ করতে এসে খর দূষণ মারা পড়ে। ভগ্নদূত গিয়ে রাবণকে সব জানায়। কাহিনীর জোড় লাগে ডাকের বচনে।

খর ঢুসন মারা পইরে অরণ শব্দ হইলো।

ভগ্নদূত রাবণ রাজাকে বারতা জানাইলো।।

ভগ্নদূতের কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়। সারথিকে বলে —

কান্দে কান্দে ভগ্নী মোর পরে গেল পায়।
সরবাঙ্গ জ্বলে গেল মোর অগ্নি দিল গায়।।
কান্দে কান্দে ভগ্নী মোর কান্দে মনো দুখে।
সরবাঙ্গ জ্বলে গেল মোর কাটা নাকটা দেখে।।

রাবণের যা কিছু প্রতিক্রিয়া — ভগ্নীর জন্য মনো দুঃখে তার উৎস। কাজেই রাবণ রামকে শাস্তি দিতেই সীতা হরণ করে আনে। এবং এরই ফল স্বরূপ রামের হাতে রাক্ষস বংশ ধ্বংস হয়। কাহিনীর মধ্যে এরপর রামায়ণের প্রায় সব ঘটনাই সংক্ষেপে নাট্য রূপায়িত হয়। মারীচের প্রসঙ্গ, বনবাসে রামসীতার দাম্পত্য জীবন, বালি সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান কথা, রাবণ পুত্রদের যুদ্ধযাত্রার কাহিনী, রাবণরাজার সিপাহীদের কথোপকথন — শেষ পর্যন্ত রাবণের মুখে রামের গুণকীর্তন — যুদ্ধ এবং সীতা উদ্ধার — সংক্ষেপে সবই এই নাটকে দেখানো হয়।

'রাজধারী' লোকনাটকে রাম-সীতার প্রসঙ্গ গৌণ। লঙ্কা রাজ্যের রাক্ষস বংশের বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপন এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। সীতাকে রাবণ হরণ করেছে। এই অন্যায় নিয়ে রাবণের কোনো খেদ নেই। তার দুঃখ একজন সামান্য নর তার বোন সূর্পনখার নাক কান কেটে দিয়েছে। নর কর্তৃক রাক্ষস জাতির অপমান — এটা রাবণের কাছে সহনীয় নয়। প্রবল জাত্যভিমান এবং বংশমর্যাদায় রাবণ সচেতন। রামায়ণ নিয়ে ভারতবর্ষের নানা কাহিনীতে রামচন্দ্রের স্থান মুখ্য। এখানে তা হচ্ছে না। এই গানের নাম হচ্ছে 'লংকা গান'। লংকার দিকের কথাই এখানে বেশী তাই রাবণ এই নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। রাবণের স্বদেশবোধ, জাত্যভিমান, বংশমর্যাদা, অপত্যস্নেহ, নারীদের প্রতি সম্মান, ভগ্নীপ্রেম সবকিছু মিলে রাবণ রাক্ষস মূর্তি ছেড়ে মানবীয় হয়ে উঠেছে। এই মানবীয় রাবণরূপই রাজধারী নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। এই চরিত্রটিই সকল চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে।

রাবণ — ইহি সাহারথি, আমার স্বর্ণ লংকাপুরী কেন শব্দ করেরে?

সারথি — আইগ্‌গা মহারাজ। আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ হবে না? আপনার ভগ্নি সর্বনখার নাসা কর্ণ কর্তন হইয়াছে। আর খর-দুষণ ভাই মারা পড়িয়াছে। সেইজন্য আপনার স্বর্ণ লংকাপুরী শব্দ করে মহারাজ।

রাবণ — ইহি সাহারথি, সে আমার ভগ্নি সর্বনাখাকে নিয়া আইসো আমার গোচরেরে।

(সূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করে।)

শূর্পনখা — গে রাবণ দাদা হা, মোর নাকটা কাটিয়া লিছেগে

হে রাবণ দাদা হা
ফুল তুলিতে গিসনু দাদা পঞ্চবটীর বনে
ধরিয়া নাক কান কাটি দিসে

শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ হে দাদা হা।

রাবণ ভগ্নীকে আশ্বাস দিয়ে বলে তার কোনো চিন্তা নাই —

ইহি ভগ্নি সর্বনাখা কাটিচে কাটিচে
তোর চামর নাক কান
কালি বেহানে দিমু তোক সনার
নাক-কান গে ভগ্নি সর্বনাখা।

রাক্ষস রাজা রাবণ নিজে বেদনাহত। ভগ্নীর এই দুর্দশার কথা রাবণ সারথির কাছে বলছে —

রাবণ — ইহি সাহারথি, কান্দে কান্দে
ভগ্নি মোর পড়ে গেলো পায়।
সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো মোর
অগ্নি দিলে গায়।
কান্দে কান্দে ভগ্নি মোর কান্দে মন দুঃখে
সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো মোর কাটা নাকটা দেখে।

রাবণ এই দুঃখেই সূর্পনখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়। সীতার প্রতি তার কোনো বিরূপ মনোভাব নেই বরং তার প্রতি রাবণের ব্যবহার অত্যন্ত বিনম্র। ভগ্নী, পুত্র, মাতুল প্রত্যেকের প্রতি রাবণের স্নেহ। তারাও রাবণের প্রতি শ্রদ্ধাবান। এমনকি সীতাহরণ পর্বে সীতার প্রতি রাবণের মনোরম ব্যবহার কখনই রাবণকে কপটতার পর্যায়ে নিয়ে যায় না।

লংকাপুরীতে রাবণ বিনয়ের সঙ্গে সীতার নিকট প্রেম নিবেদন করছে —

সুন্দরী নানা রত্নে পূর্ণ আমার আগার,
যত দেখিতেছো সুন্দরী সকলই তোমার।
তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী,
অনুমতি দাও সুন্দরী চল আমার অন্তঃপুরী।

সীতা — আমার সেবক কহিলেন আপুনি
সেবক হইয়া কেন লংঘ ঠাকুরানী।
সেবক হইলে সেতো হন গুরুজন
সেবক হইয়া কেনো বলো কুবচন।
রামে প্রাণনাথ মোর রামে দেবতা

রাম ছাড়া অন্যজনকে নাহি চায় সীতা।

রাবণ — রামতো সামান্য নর অল্প তার ভক্ষণ
যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন।

সীতার প্রতি রাবণের এই ব্যবহার অপূর্ব শালীনতা পূর্ণ। এই শিষ্টতাই এ নাটকে রাবণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রাণী মন্দোদরীর প্রতি রাবণের সম্মান প্রদর্শন লক্ষণীয়। সীতার জীবনহরণে রাবণকে নিষেধ করছে মন্দোদরী।

মন্দোদরী — শুন শুন মহারাজ শুন মোর বাণী,
নারী হত্যা মহাপাপ সর্ব শাস্ত্রে শুনি।
শত মুনি বধিলে যত পাপ হয়,
এক নারী হত্যায় তত পাপ জানহ নিশ্চয়।

মন্দোদরীর কথা রাবণ মেনে নিয়েছেন। এতে শ্রোতাদের মন মুগ্ধ হয়। যুদ্ধ-সংকটে জয়ী হবার বাসনায় এক এক করে পুত্রদের সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠানোর সময় তাদের প্রতি পিতার মমতাময় আচরণে ও মন ভরে ওঠে। সারথি নির্দেশ মতো ইন্দ্রজিতকে রাবণের সম্মুখে হাজির করে —

ইন্দ্রজিৎ — ওগো পিতা লংকেশ্বর গে
আপুনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র আইলাম গে পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ — ওরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ, আইসো আইসো
পুত্র, তুই মোর বৈসো রত্ন সিংহাসনে
ত্রিফুল তামাকু মোর করহো ভক্ষণরে।

রাবণ পুত্রকে সস্নেহে কাছে ডেকে বর্তমান লংকার দুর্দশা বোঝাচ্ছেন এবং তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এইভাবে তাঁর অন্যান্য পুত্রদেরও কাছে ডেকেছেন এবং কর্তব্য সচেতন করেছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে সমস্ত লংকাপুরী শোকে হাহাকার করে উঠছে। সারথীর নিকট এই সংবাদ রাবণ জ্ঞাত হওয়ার পর ভ্রাতুষ্পুত্র তরণীসেনকেও ঠিক একইভাবে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। ভাই বিভীষণের শত্রুতাকে রাবণ ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট তুলে ধরেছেন অদ্ভুত বেদনার মধ্য দিয়ে —

রাবণ — ইহি পুত্র মোর তরণী,
শুনহ পুত্র তুই মোর দুঃখের কাহিনী।
বিভীষণ ধর্মে তৎপর,
হিত উপদেশ কত বুঝাইলো বিস্তর।
অহংকারে আমি ছিন্ন কইনু মতি,

বিনা অপরাধে ভাইয়ের বুকে মারিনু লাথি।
আমারে ছাড়িয়া ভাই বিভীষণ,
অনুরাগে লিয়াছে রামের শরণ।
ইহি পুত্র মোর তরণী —
রাক্ষসকুলের তুই হয়েছিস সুসন্তান
নর বানর মারিয়া রাখ আমার সম্মান।

তরণীসেনের প্রতি যেরূপ মমত্ববোধ তা তিনি মহীরাবণের ক্ষেত্রেও প্রকাশ করেছেন। পিতার আহ্বানে মহীরাবণ এসে বলে —

ওগো পিতা লঙ্কেশ্বর, সে তোমার মহীপুত্র আইলামগো পিতা লঙ্কেশ্বর

এর উত্তরে রাবণ বলে — আইসো পুত্র যে তুই মোর বস রত্নসিংহাসনে,
ত্রিফল তামাকু মোর করহ ভক্ষণ রে।

মহীরাবণ — ওগো পিতা লঙ্কেশ্বর, বসিলাম বসিলাম পিতা
তোমার রত্ন সিংহাসনে
ত্রিফুল তামাকু তোর করিলাম ভক্ষণ গে পিতা।
সে আমাকে কেন ডাকলেন গে পিতা লংকেশ্বর।

রাবণ — ইহি পুত্র মোরে মহী
শুনহ পুত্র তুই মোর দুঃখের কাহিনী
সর্বনাখা তব পিসি আমার ভগিনী
হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক কান
কেমনে সহিবো বল এত অপমান রে।

এই নাটকে রাবণকে কখনও উগ্র বা উদ্ধত দেখানো হয়নি। তার ভগিনী সূর্পনাখার অপমান, রাক্ষস জাতির অপমান — এটা রাবণের পক্ষে অসহনীয়। তাই সে সীতা হরণ করেছে। রাক্ষস জাতির অপমান সহ্য করতে না পারা রাবণ চরিত্রের নৈতিক ভিত্তির মূল। রাবণ ঠিক ভোগের জন্য সীতা হরণ করে নি, করেছে রাম লক্ষ্মণকে সমুচিত দুঃখ দিয়ে ভগ্নী সূর্পনখা ও রাক্ষস জাতির অপমানের প্রতিশোধ নিতে। রাবণের কথা শুনে মহীরাবণ রাম লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে গিয়ে বধ করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। রাবণ আশ্বস্ত হয়। পুত্রদের প্রতি তার স্নেহও খুব প্রবল। বরং ভাই বিভীষণ তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে — এটা যেন তারই দোষ।

রাবণকে বলতে শোনা যায় তরণীসেনকে উদ্দেশ্য করে —

'অহংকারে আমি ছিন্ন কইনু মতি
বিনা অপরাধে ভাইয়ের বুকে মারিনু লাথি
আমারে ছাড়িয়া ভাই বিভীষণ
অনুরাগে লিয়াছে রামের শরণ'।

রামচন্দ্রের কাছে নাটকের শেষে গিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের পূর্বে নিজের বেদনাকে প্রকাশ করছে রাবণ —

এ প্রভু, ঘরে ঘরে মোর কান্দে রানীগণ
শুন প্রভু রঘুনাথ রে
এ প্রভু, সর্বনাখড়ার কথা ধরনু
লংকাপুরী শূন্য করনুরে হে
বাতি দিবার মোর কেহ না রহিলো রে হে

সম্মুখ যুদ্ধের ঠিক পূর্বেই রাবণের মনের গভীর বেদনা ক্রন্দন হয়ে প্রকাশিত হয়। সেই সময় দর্শকগণও বেদনায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। রাবণের এরূপ পরিবর্তন দর্শক মনকে কারুণ্যে মথিত করে। রাজধারী নাটকে রামায়ণের বহু চরিত্রের ব্যবহার করা হয়। বহু চরিত্রের পারস্পরিক কথপোকথন, সংলাপের বৈচিত্র্য দ্বন্দ্ব সবমিলিয়ে নাটকটি হয়ে উঠেছে এক কথায় অভিনব। শুধুমাত্র রাবণ চরিত্রের কাহিনীই এখানে মুখ্য হয় নি। রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রকে এখানে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজধারী গান রামায়ণ কাহিনীর লৌকিক নাট্যরূপ। কাজেই এর মধ্যে সমকালীন জীবনের কথা না থাকারই কথা। আমাদের বিশ্লেষিত কুশান পালা অংশে দেখিয়েছি সেখানে রামায়ণের অনুসরণ যথেষ্ট মূলানুশ্রিত। কিন্তু রাজধারী পালাগানের মধ্যে রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে লোকজীবনের কিছু কথাও মিশে গেছে। এ কারণে রামায়ণ কথার আশ্রয় করলেও পালাটি রাজবংশী জীবনের কথার একটি ছবি রূপে ফুটে উঠেছে। এতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের লোকজীবনের চিত্র বৈষ্ণবতা, রামভক্তি এসবই প্রতিফলিত হয়েছে।

কাহিনীর শুরুতেই যে গৌরবন্দনা পাওয়া যায় তাই যেন পালার মূল ভাবটিকে স্থির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

একবার দয়া করে আয় হে গরা, কৃপা করে আয়

এই সমবেত প্রার্থনা — সমষ্টি জীবনের মূল ভাবটিকে তুলে ধরে লোকজীবনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিস্ফুট করে তোলে। উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে বৈষ্ণবতার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের ভাবটি এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও প্রতিফলিত হয়। রাজধারীগানের এই গৌরবন্দনায় সেই ভক্তিভাবেরই প্রকাশ ঘটে। মঞ্চে মুনিদের কথোপকথনের ভঙ্গিটিও লৌকিক জীবনেরই অনুসরণ। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে মুনিদের পরিচয়

পর্ব, রামের মুনিচরণ বন্দনা মুনিদের রামকে সতর্ক করে দেওয়া সবই সেই লোকজীবনের অনুরূপ। যখন সূর্পনখা মঞ্চে এলো তখনকার যে সংলাপ তা নিতান্ত লৌকিক। তার মধ্যে নারী সম্পর্কিত লোক মনস্তত্বও স্পষ্ট।

সূর্পনখা — এ বাই, বাইগে হে, লোকলা এখে সঙ্গে আসল, ভাউজিটা মোর কুন লাংগের মুখ দেখবা গেল সনা।

মঞ্চের ব্যক্তিগণ — ভাউজি তুই লাংগের মুখ দেখফা গিসলো...

সূর্পনখা — এ ভাউজি দেখদি, বাঁশের আগালিটাত ঘুঘুর ডিমাডা

এখানকার উক্তিতে নারীর সামাজিক অবস্থার কথা একটি সম্পর্কের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। সামাজিক জীবনের সত্য তা হোক আর নাই হোক, তাতে সামাজিক মনস্তত্ব পরিষ্কার বোঝা যায়।

সূর্পনখার নাক কান কাটা গেলে মঞ্চে 'পেটবীর' ওঝার প্রবেশ ঘটে। 'পেটবীর' ওঝা কথাটি যথেষ্ট ইঙ্গিতাত্মক সামাজিক মানুষের এই নামকরণে যেমন সত্যের আভাস ফুটে ওঠে তেমনি পাই তার পরিহাস প্রিয়তার পরিচয়। 'পেটবীর' ওঝা যেভাবে সূর্পনখার কাটা নাক কানের চিকিৎসা করে তাতে এই ওঝার চিকিৎসা শক্তির পরিচয় পাই। আর পাই লোক কবির পরিহাসপ্রিয়তা। নাটকে এইভাবে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন লোককবি। আসলে এগুলি সমাজে প্রচলিত কৌতুক — সেগুলিই নাটকে উঠে এসেছে।

ওঝা — এ সর্বনাখা তোর যে নাকটা কাটা গেল এনোং করি, রোভো না আউসত লাগাবো ?

সূর্পনখা — আউসত ছে নাকি তে রে, ছে তে দে।

ওঝা — ছে। একখান কাটা ঘাউয়ার ঔযদ জামরির রস, বাঘ মরিচ ও নুন, এখেটে বেনালছে যেদি এইখান লাগাদেবি আলায় খরখরা হয় যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

সূর্পনখা — দে দে লাগায় আউসতখান

বলাবাহুল্য এই রসিকতা অত্যন্ত মোটা দাগের। কিন্তু যে শ্রেণীর শ্রোতা এই নাট্যরস পিপাসু তারা এই রসিকতা থেকেই আনন্দ আহরণ করে

রণস্থলে দূষণের মৃত্যু হয়েছে খর প্রবেশ করে জানতে চায় — ওরে সৈন্যগণ আমার ভ্রাতা কোথায় ?

সৈন্যগণ উত্তর দেয় — ''মহারাজ রণস্থলের পশ্চিম পাকায় গাড়ী উলটায় দিছে''

'গাড়ী উলটায় দিছে' — নিতান্ত আঞ্চলিক ইডিয়ম। এর দ্বারা মৃত্যুর কথাটি বোঝানো হল।

বনবাসে রাম সীতার সুখী দাম্পত্য চিত্র নাটকের মধ্যে দেখাতে হলে অন্তত পুরো একটি দৃশ্য ব্যবহার করে সেই চিত্র রূপায়িত করতে হত। রাবণ যখন মারীচকে নিয়ে সীতা হরণের জন্য পঞ্চবটী বনে এসেছে — তারই ঠিক আগে রাম সীতার এই দাম্পত্য সম্পর্ক দেখানো খুব প্রয়োজনীয় ছিল। মাত্র ছোট্ট একটি দৃশ্যে সেই সম্পর্ক

দেখানো হল। রাম সীতার প্রসার খেলা।

গান — রাম সীতা প্রসার খেলিতে লাগিলো

সীতার গান — হারিলো হারিলো হারিলো রে - স্বামী তুই হারিলো, ওরে এতয় রমণীর মাঝে প্রসারে রে স্বামী তুই হারিলো।

ডাক — প্রসার খেলিয়া প্রভু আনন্দ হইলো। হেন সময় ময়ামৃগি যেন পন্থে দেখা দিল।।

লোককবির এই নাট্যবোধের প্রশংসা করতে হয়। যেভাবে তিনি রামসীতার এই সুখী দাম্পত্য জীবন চিত্র রচনা করে তারই পটভূমিতে সীতাহরণ বর্ণনা করলেন তা যথেষ্ট নাট্যগুণের দাবী করে। অন্যপক্ষে তার যে লৌকিক রূপ সেটিও স্মরণযোগ্য। বনবাসে রামসীতার প্রসার খেলা যে কতটা অসম্ভব তার কথা মনে না রেখে সীতার গানে বলা হয়েছে "এতয় রমণীর মাঝে প্রসারে রে স্বামী তুই হারিলো।" প্রসার খেলা উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের সঙ্গে জড়িত। এই দৃশ্যটি তাই একই সঙ্গে রামসীতার দাম্পত্য জীবন ও লোকজীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাচক।

রাবণের সৈন্যদের কথোপকথন অংশটি ও লোকজীবনের চিত্ররূপ।

সিপাহি — আরে চুপ চুপ। আপ কৌন হ্যায় জী

সারথি — আরে হাম গাঁওকা মণ্ডল হ্যায় জী। আপ কৌন হ্যায় জী ?

সিপাহি — ও গাঁওকা মণ্ডল হামকো নেহি পয়হচানতে ?

হাম রাজা লঙ্কেশ্বর কা সিপাহি হ্যায় জী।

সিপাহি লঙ্কেশ্বরের জন্য রাজবাড়ী নির্মাণ করবে। তাই লোক চাই। কালুয়াকে ডেকে আনা হয়।

সারথি — একালুয়া দেখেক রাজা লঙ্কেশ্বরের সিপাহি

কালুয়া — উ হু মুই বুঝবা নি পানু

সারথি — আরে সিপাহি কাথা যখন বুঝবা নিপালো বরকন্দাজত বুঝিস। এহে রাজা লংকেশ্বরের বরকন্দাজ।...

সিপাহি — কালুয়া দেখো হিয়া রাজা লঙ্কেশ্বর আয়গা রাজপুরি নির্মাণ করনে হোগা...

কালুয়া — মোর দ্বারা হোবেনি বারে, মোর পিছলাহে অমহার দ্বারা হোবে।

সিপাহি — ওহি বোলোরে কালুয়া। তুম জাতমে ছোটাহ্যা লোকিন বাতমে তো বরে বরে রস হ্যারে। জলদি পুকারো উলোককো।

সিপাহির কথায় কালুয়া বলে — তমহায় ডাকায়

সিপাহি জিগ্যেস করে — কিয়া নাম হ্যায় উসিকা

কালুয়া বলে — ও মোর মাও।

সিপাহির সন্দেহ হয়। সে সারথিকে জিজ্ঞেস করে। সারথি বলে মেয়েদের এভাবে ডাকা হয়। সিপাহি ডাকে। তাতে আসে কালুয়ার দুই বৌ। দুই বৌএর সঙ্গে কালুয়ার কথোপকথনে রাজবংশী সংসারের ছবি ফুটে ওঠে।

বড়বৌ — এ মাই, তোক কুন কহে গিছে

ছোটবৌ — মোক কুননি কহেগে ভাই

বড়বৌ — চলধি এইডা বাড়িত পুছারি করমো কভা কভাবারচেন নি কাহ ...

কালুয়া — খরাক আইনচেন দেখাও

ছোটবৌ — এ মোর বাপ আগুত বিরিডা খায়েলে শালাই মুই আনুনি কেনং করে খাবো

বড় বৌ — খা বিরিডা লক্ষ্মীছাড়া বৈরাগী

কালুয়া— দে খরাকলা। ধর বিরিডা ফুকে ফুকে রাখিম তাহে মুই খরাকলা খাম।

ছোটবৌ — বিরিডা খাবোনি তাহলে। মুই সিপাইডার তানে চলে গেনু।

রাজধারী নাটকের পৌরাণিক রাম রাবণের গল্পোর আবহে এইভাবে ঢুকে পড়ে লোকজীবনের এক চিলতে দৈনন্দিনতার ছবি।

সাধারণ চরিত্রগুলি যথাক্রমে সারথি, সিপাই, সুন্দরী যুবতী ইত্যাদির কথোপকথনে এলাকার বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক সময় পৌরাণিকের ভিতর লৌকিক বিষয়ও ঢুকে পড়েছে।

উদাহরণে দেখা যায় —

তিরসিরা বীর সাজিলো রে
সাজিলো তিরসিরা বীর টেপাগুলির নাতী
ধুতির গুনজাত বান্ধিয়া লিছে গান্ডা চারি হাতি।
এমন বীর সাজিলো ভাইরে
আগো পাছো না ভাবিয়া
বীরের মধ্যে বীর সাজিলো কাংক্ষে বন্দুক লয়া।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা, দৈনন্দিন চাল-চলন, খাদ্যাভ্যাস, গ্রামীণ কুটীর শিল্প, সামাজিক ন্যায়বোধ, এইগুলি রাজধারী নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। এলাকার কৃষি-ফলনের বিভিন্ন দিকগুলিও উল্লেখিত হয়েছে। সামাজিক আপ্যায়নে তামাকের ব্যবহারও লক্ষণীয়। তামাক সেবনের মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। রাবণ তাঁর ভ্রাতা বিভীষণ, পুত্র ইন্দ্রজিত, তরণীসেন যাদেরকেই আহ্বান করে নিয়ে এসেছেন সকলকেই তামাক সেবনের জন্য বলছেন —

'ওরে ভাইরে বিভীষণ।
আইসো আইসো ভাই মোরে
বস রত্ন সিংহাসনে
ত্রিফুল তামাকু মোরে
করেঁহ ভক্ষণরে ভাই বিভীষণ।'

তৎকালীন গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ ওঝা বা কবিরাজরা গ্রামীণ পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করতেন। সে রকম চিত্রও পাওয়া যায়। শূর্পনখার নাক-কান কাটা গেলে শূর্পনখা ওঝার কাছে ছুটে যায়।

ওঝা বলে — 'ছে একখান কাটা ঘাউয়ের ঔসদ
জামরির রস, বাঘ মরিচ আর নুন এখেটে
বানায় লাগাদিলে আলায় খর খর
হয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে।'

এটা ঠিক কাটা ঘায়ের চিকিৎসা নয় — রসিকতার জন্য এটি বলা হয়েছে। গ্রামীণ যাদু বা ইন্দ্রজালও কখনো কখনো নাটকে সৃষ্টি করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যের জন্য তেল জাতীয় কোনো দ্রব্য মুখ থেকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আগুন ধরানো হয়। তাতে মুহূর্তে আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে যায়। সম্পূর্ণ নাটকটি হয়ে উঠেছে ঐ অঞ্চলের সমকালীন দর্পণ।

রাজধারী লোকনাট্যে সংলাপের ব্যবহারে নানারকম বৈচিত্র্য রয়েছে। সংলাপ নাটকের মুখ্য বিষয়। সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের ক্রমবিকাশ ঘটে। লোকনাট্যে গদ্য সংলাপের চেয়ে পদ্য-আকারে সংলাপের আধিক্য বেশী। এই লোকনাট্যে গদ্য আকারে, পদ্যের আকারে এবং সর্বোপরি গানের মধ্য দিয়ে নাটকের বিষয় বস্তু পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। এছাড়াও মূল গায়ক এবং বাদ্যকারেরা ঘটনার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করার জন্য উচ্চস্বরে ছন্দবদ্ধ ডাক ও গানের ধুয়ার সাহায্যে কাহিনীর ঐক্য বজায় রাখেন। সাধারণ চরিত্রগুলি যখন কথাবার্তা বলেন তখনই গদ্যের ব্যবহার বেশীমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

বড় বৌ — এ মাই তোক কুনে কহে গিছে
ছোটো বৌ —মোক কুনেনি কহেগে বাই
বড় বৌ — দাদাগে দাদা হামার বাপটা তমহার
এইতি আইচি না কিগে, তমহা কাহো
কভা পারবেন?
সারথি — কায়, উলাতো মাই তমহার বাপটা

খোব বেহানে হামার এই পাকে গিছে।

কখনো কখনো প্রধান চরিত্রগুলি সাধারণ গদ্যে কথপোকথনের মধ্য দিয়ে পদ্য সংলাপে প্রবেশ করেন।

শূর্পণখা (গদ্যরূপে) — গে রাবণ দাদা হা, মোর নাকটা কাটিয়া লিছে গে, হে রাবণ দাদা হা।

রাবণ (গদ্যরূপে) — ইহি ভগ্নি সর্বনাখা, এ দুখদসা তোর কে করেছে। সে তুমি প্রকাশ করে বলো রে।

শূর্পণখা (পদ্যরূপে) — ফুল তুলিতে গিসনু দাদা পঞ্চবটির বনে।
ধরিয়া নাক কান কাটিছে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে।

রাবণ (পদ্যরূপে) — ইহি ভগ্নি সর্বনাখা কথাকার বসন্তি তারা কাহারে নন্দন।
কি জন্যে ফিরে তারা পঞ্চবটির বন।

শূর্পণখা (পদ্যরূপে) — অযুতা নগরে ঘর দশরথ নাম।
চারিপুত্র জন্মিলো জেষ্ঠ পুত্র রাম।
ভরতকে রাইজ্য দিলো না দিলো রামকে।
সত্য করে কৈকয়ী মাতা পাঠাইলো বনে।।
ঝটা বাকুল পইরিধন তপসিয়ার ভেশ।
পিতার সত পালিতে দুই ভাই ফেরে দেশ দেশ।।
পিতার সত পালিতে দুই ভাই হয়েছে বনচারী।
তাহা সঙ্গে ফিরে একটা সুন্দর নারী।
খাইবার ছলে দাদা গিয়াছিনু বনে —
ধরিয়া নাক কান কাটিচে শিরামের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে।

রাবণ (পদ্যরূপে) — কাটিচে কাটিচে ভগ্নি তোর চামর নাক কান।
কালি বেহানে দিমু তোক সনার নাক-কান।

এর পরেই ফিরে আসে গদ্য সংলাপ —

শূর্পণখা (সারথিকে উদ্দেশ্য করে) — এ সারথি শুনলো নাতে দাদা ডাকি কোহোল।

সারথি — শুননু নাতে। চামড়ার নাকত তোর সলার নাক দিবে।

শূর্পণখা — এ সারথি, সলার না হয়রে, সনার দিবা চাহালো।

এইভাবে সংলাপের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক গদ্যের ব্যবহার করা হয়। গদ্য সংলাপ শেষ না হতে হতে পদ্যের সংলাপ শুরু হয়। আবার প্রয়োজন মতো গানের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ধ্বনির ক্ষুদ্র পার্থক্যে রসিকতা

সৃষ্টি করা হয়। লক্ষ্মণ একটি গানের মধ্য দিয়ে সীতাকে বোঝাচ্ছে —

ওকি ও জানকি, শুনো জানকি ময়া না রাইক্কস
ময়া না রাও ছাড়ে।
বলো কার বাপের শকতি আছে হে দাদাক
মারিবারে বোলো হায় হায়।
আমাক ছাড়িয়া গুণের ভাই মোর গেলো
কুন বা দেশেরে হায়রে হায়।

মায়ামৃগের পশ্চাতে রামচন্দ্র ধাবিত হলে দুঃখে লক্ষ্মণ সীতাকে তার বেদনা জ্ঞাপন করছে। মূল গায়ক 'ডাক' এর মাধ্যমে ঘটনাকে সংযুক্ত করেন।

ডাক — 'অযুতা কান্ডতে হইলো শ্রী রামের বন
অরণ কান্ডতে সীতাকে হরিছে রাবণ'

এইরকম বিভিন্ন প্রকার ডাকের মধ্য দিয়ে কাহিনীর জোড় দেওয়া হয়ে থাকে।

রাজধারী গানে সঙ্গীতের সংখ্যা কম নয়। অনেকগুলি সঙ্গীত এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। বন্দনা গানের পর আসে কথোপকথন তারপর রামের গান। বিরাট ও উর্মিলা রাক্ষসের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধের কথা গায়কদের গানে প্রকাশিত হয়। এই গানগুলির গায়নরীতিতে এবং সঙ্গীতের প্রয়োগে যুদ্ধের ভাব ব্যক্ত হয়। গানের মধ্য দিয়েই বিচ্ছেদ, মৃত্যু ও দুঃখজনক পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলা হয়। বীররসপূর্ণ সঙ্গীতও এতে দেখা যায়। রামের সঙ্গে তিরসিরার যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

"ওই আরে দিম দিম তিরসিরা বীর যুদ্ধ করেরে
প্রথমতে হইল্ বীরের মুখোতে গালাগালি
ও বীর যুদ্ধ করে রে।
ওরে দুইঝনকার ভরে যেন মোর কাপেচে মেদিনী
দুইজনে যুদ্ধ করে দোহে রে মহাবলী।
ও বীর যুদ্ধ করেরে
ধনুকে ছুড়িলো প্রভু ব্রহ্ম-অস্ত্র বান
ও বীর যুদ্ধ করেরে।

তিরসিরার মুণ্ড কাটে কইলে খান খান
ও বীর যুদ্ধ করে রে।''

বলা প্রয়োজন প্রত্যেকটি যুদ্ধের বর্ণনায় এই গান গায়কের মুখে বসানো হয়েছে। কেবল যোদ্ধাদের নাম বদলে গেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে একটি গানই তৈরি করা হয়েছে। সেই গান যে কোন যুদ্ধের সময়ই গাওয়া হচ্ছে। এই গানগুলির মধ্যে বীররস অপেক্ষা যুদ্ধের বর্ণনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অন্যান্য রসের গানের ক্ষেত্রেও বর্ণনাই মুখ্য। সীতা বিহনে রামের বেদনা নিচের গানটিতে প্রকাশিত হয়েছে —

'ও ভাইরে লক্ষ্মণ তুমি ভাই মোর ছাড়রে
আমি যাছি গৃহমাঝেরে ভাই
হায় হায়রে দারুন বিধি আর কি না হইলো
ফুলের কমল সীতা কুন বা দেশে গেলো।'

সূর্পনখা সুন্দর রূপ ধারণ করে যে গান গেয়েছে সেটিতে প্রেমিকা নারীর মনোভাব ফুটে উঠেছে —

ওই মন মানে নাগো সই দিন মানে না
আমি করি কি উপাইগে সোয়েই মন মানে না —

এরপর রামের কাছে গিয়ে সূর্পনখা নিজের কথা বলে —

ওকি ও তপসিয়ার গসাই শুন তপসিয়ার গসাই...
আমি তোমার পুতলী হোবো আমার বিয়ে করহে
তপসিয়ার গসাই।

গান, পদ্য সংলাপ আর গদ্য সংলাপে কাহিনীর নাট্য উপস্থাপনা হয়। গানগুলির অধিকাংশই বর্ণনামূলক, তাতে কাহিনীর বর্ণনা আছে। গানগুলিতে ভাবের কথা কম, প্রায় নেই। গান যেখানে ভাবের প্রকাশ সেখানে তার রস সৃষ্টির শক্তি বেশি হয়। এসব নাট্য সঙ্গীতে তার অবকাশ কম। রাবণের একটি গানে রামের আশ্রয় গ্রহণের কথা আছে। ভক্তের আকূতি তাতে কিছুটা ফুটেছে। সাধারণ শ্রোতাদের চিত্তে রাবণের এই ভক্তি নিবেদন কারুণ্য ও ভক্তিবিনম্রতা সৃষ্টি করে। রাবণের গান —

এ প্রভু তুইহে মাতা মোর
তুইহে পিতা, তুই হলো মোর জনম দাতারে
এ প্রভু অভাগিয়া যার আর কেহো

নাই, শুনো প্রভু রঘুনাথ রে
এ প্রভু ছিলো পুত্র মোর মেঘনাদ
আহা মরিরে তাহায় গেলো মোর।
এ প্রভু ঘরে ঘরে মোর কন্দে
রানীগণ শুনো প্রভু রঘুনাথ রে।
এ প্রভু সর্বনাখার কথা ধরনু
লংকাপুরী শূন্য করনুরে
বাতি দিবার মোর কাহ নাই রহিল্
আররে হে।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন লোক নাটকে বিভিন্ন রকমের লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় দোতারা, কুষাণ, চোর-চুন্নী ইত্যাদি লোকনাটকে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। সেটা কখনো চটকারূপে আবার কখনো দরিয়া রূপে। তরাই অঞ্চলের লোকনাটকে এখানকার লুপ্ত প্রায় লোকসঙ্গীত 'লাহাংকারী'-রই প্রভাব সবচাইতে বেশী। দীর্ঘ-বিলম্বিত লয়ে লাহাংকারী গান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে বিরহই মুখ্যত ফুটে উঠে। কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গভীর বেদনাই এর মধ্যে ব্যক্ত হয়। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নারী মনের বেদনা, মৃত্যু চেতনার ভাবনা ছাড়াও জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে। এই 'রাজধারী' লোকনাটকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই লোকসঙ্গীত 'লাহাংকারী' গানের প্রয়োগ আছে।

লোকনাট্য লোকজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার গায়ক সাধারণ লোক, তার শ্রোতাও সাধারণ গ্রামীণ কৃষক মজুর বা সাধারণ কোনো জীবিকার মানুষ। লোকনাট্যের বিষয় সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নেওয়া। পৌরাণিক কাহিনী হলে তাকে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় নাট্যরূপ দেওয়া হয়। তার ভাষায় থাকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত বাক্‌ভঙ্গি এবং শব্দ ব্যবহার। গূঢ়োক্তি কিংবা অলংকৃত বাক ব্যবহার তার মধ্যে দেখা যায় না। ভাওয়াইয়া গানে তবু কিছু কিছু স্বভাবোক্তি বা উপমা রূপক দেখা যায়। কিন্তু লোকনাট্যের ভাষায় এরকম অলংকৃত সংলাপ ব্যবহার করা হয় না। নাট্য সংলাপকে হতে হয় প্রত্যক্ষ এবং তীক্ষ্ণ যাতে তা বক্তার কথা শ্রোতার কানে পৌঁছোতে পারে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নাগরিক নাট্য সংলাপের ভাষা কিছুটা অলংকৃত হয়েছে। লোকনাট্যে তা আশা করা যায় না। তবু পদ্য সংলাপে রামায়ণের উপমা হুবহু উঠে এসেছে। যেমন মারীচ রাবণ রাজাকে তার কর্ম দোষ স্মরণ করিয়ে বলছে —

যেমন ছুটিলে হস্তি না রহে অংকুশে
লংকাপুরী তেমন মজিবে তব দোষে

ভিক্ষুকবেশী রাবণ সীতাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

ও মা সীতা, সুরধনি চন্দ্রবদনী
তার মধ্যে সৌন্দর্যের উপমা প্রচলিত বা গতানুগতিক।

দূষণের উক্তিতে অলংকার প্রয়োগ ভেক হয়ে করিস কি ভৃংগের মস্তকে পদালত বামন হয়ে কর কি চান্দের অপ বিলাস ইত্যাদি।

ছন্দের দিক থেকে বলতে গেলে 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দেরই আধিক্য বেশী। রাজধারী লোকনাটকের ভাষা উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের মুখের ভাষা, এই এলাকার বসবাসকারী মুখ্য জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায় মানুষের ব্যবহৃত ভাষা। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ বাংলার ব্যবহার প্রচুর রয়েছে। বিশেষ কয়েকটি সংলাপ এখানে উল্লেখ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে এই অঞ্চলের মৌখিক ভাষাটিকে বুঝে উঠতে সহজ হবে।

রাবণ — ইহি মারিচ মোর মামু চৈদিগে নাগর
চৈদিগে সাগর তার মধ্যত তোর ঘর
রথে চইড়ি আইলাম বাফু তোর গোচরে

মারিচ — ইহি ভাগিনারে দশানন
আইসো আইসো ভাগিনা বইসো
রত্ন সিংহাসনে
তিরিফুল তামাকু মোর করহো ভক্ষণ রে

রাবণ — ইতি মারিচ মোরে মামু। না বসিবো
না বসিবো তোর রত্ন সিংহাসনে
তিরিফুল তামাকু তোর না করিবো ভক্ষণ
আগে যদি আমার সঙ্গে কর সতবন্দি
তবে না বসিবো তোর রত্ন সিংহাসনে।

মারিচ — আজ কেন এতো ক্রুধ্য কেন বাফুরে

আমি রাইক্কস জাতির সঙ্গে সত্য করবো না
বাফুরে।

রাবণ — ইহি মারিচ মোরে মামু,
লক্ষ্মী, সরস্বতী, নান্ধন নান্ধে
পবন দিয়া ধারা।
সত্যের ক্ষণেক হইলে তোর
লাথিয়ায় ভাংগিম দন্তেরর বারারে।

রাবণ ও মারিচের কথোপকথনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কোথাও উপভাষার শব্দ ব্যবহার আবার কোথাও শব্দগুলি শুদ্ধ বাংলার শব্দরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। বস্তুত অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকদিগের দিকে তাকিয়ে অভিনেতারা ভাষাকে লোকের বোঝার মতো করে ব্যবহার করেন।

আঞ্চলিক ভাষারূপের সঙ্গে চলিত ভাষার চিত্রকে এ লোকনাট্যের ভাষা একটা কাব্যিক ভাষার রূপ পেয়েছে—

ওরে বাপু ছাইলার তিনজন
কথাকার বান্তি কাহার নন্দন
কিসের জন্য ফির বাপু পঞ্চবটী বন রে —

'খন'

উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় এক ধরণের গ্রামীণ লোকনাট্যের প্রচলন দেখা যায়। এগুলিকে এখানে 'খন গান' নামে অভিহিত করা হয়। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে ইসলামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডী, কুমারগঞ্জ গঙ্গারামপুর তপন সর্বত্রই খনগানের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলি অঞ্চল বিশেষ এক একটি চরিত্র-ধর্ম লাভ করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনজপুরে এই লোকনাট্য 'খন' নামে বিশেষ পরিচিত। মালদহে গম্ভীরা, কোচবিহারে কুশান ও দোতরা পালা বিখ্যাত।

'খন' কেন এই লোকনাট্যের নাম হল সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলা যায় না। পুষ্পজিৎ রায় একটি প্রবন্ধে 'খন' অর্থে উৎসবকাল বা অবসরকাল ধরে একে উৎসবকালের বা অবসরকালের গান বলেছেন। "উৎসবের কালে চিরামের অবকাশে সৃষ্ট ও অনুষ্ঠিত পালাগানকে খন গান বলা যেতে পারে।" তিনি আবার একে আনন্দ উপভোগের জন্য গাওয়া গান বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই অর্থে দেখলে যে কোনো গ্রামীণ লোকনাট্যই উৎসবে বিরামে বা আনন্দের জন্য গীত হয়। পুষ্পজিৎবাবু নিজেই আবার অন্য একটি অর্থ সন্ধান করেছেন। খন গানের বিষয়বস্তুতে থাকে অপ্রকাশ্যে সংঘটিত অনৈতিক প্রণয় ঘটনা। খন গানে এই ঘটনাকে সাধারণের সম্মুখে পরিবেশন করা হয়। এই কাহিনী খনন করাকে তিনি খন বলেছেন। ক্ষত থেকে খন হতে পারে বলেও কারো কারো ধারণা।

চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি 'খন'। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য যে নাটকগুলিকে প্রকৃত লোকনাট্যের মর্যাদা দিয়েছেন খন তাদের অন্যতম। খন গানে লোকনাট্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয় তার মধ্যে মুখ্য হল এগুলি গ্রামীণ জীবনের বাস্তব ঘটনা নির্ভর কাহিনীর নাট্য উপস্থাপনা। মুখে মুখেই এর সংলাপ রচিত হয়। গ্রামে সংঘটিত কোনো নাট্য সম্ভাবনা পূর্ণ ঘটনা নিয়েই এই নাটক উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত অবৈধ প্রণয়ই এর বিষয়। একে নৃত্যে সঙ্গীতে সংলাপে রূপায়িত করাই এই লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য।

'খন'-এর উপস্থাপন মঞ্চ অনেকটা বৃত্তাকার ক্ষেত্র। বৃত্তের ঠিক ভেতরের অংশে দোহার-পার্টি এবং বাজানদাররা বসেন। তাঁদেরকে ঘিরে আভিনয় স্থল, এবং অভিনয় স্থলকে ঘিরে দর্শক শ্রোতাগণ বসেন। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। দর্শকের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিনেতার ইচ্ছা যুক্ত থাকে নিবিড়ভাবে এই 'খন' গানে।

অনুষ্ঠান আসর বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। আসর বন্দনায় নারী-পুরুষ মিলে প্রদীপ ও ধূপবাতি হাতে নিয়ে

প্রথমে পূর্ব-উত্তর, পশ্চিম-দক্ষিণ দিক ঘুরে ঘুরে দিক্ বন্দনা এবং আসর বন্দনা করেন। এই বন্দনার সময় বিভিন্ন দেবতার বন্দনা যেমন করা হয়, তেমনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে দশ ঠাকুরের চরণ বন্দনা অবশ্যই করা হয়। মূল অভিনয় শুরুর আগে সকল দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধকর বন্দনার ভিতর দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। দর্শকদিগদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ থাকে। তাই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দেবতার বন্দনা পুরানো কাল থেকে চলে আসছে।

লক্ষ করা যেতে পারে —

বন্দি মাতা বীনাপাণি জগৎ মাতা জননী
তোমারি চরণ প্রণাম করি।
পূরবে বন্দনা করি ভানু দিগম্বর,
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,
সেই পর্বতে বসত করে যত মুনিগণ,
তাহাদের চরণে আমরা করিগো প্রণাম।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা মদিনা
দক্ষিণে বন্দনা করি সপ্তসাগর লংকা
লংকা দ্বীপে বসত করে
দশমুণ্ড রাবণ,
তাহারি চরণ আমরা করিগো প্রণাম।
গ্রামের মধ্যে বন্দনা করি যতয় দেবগণ,
তাহাদের চরণ আমরা করিগো প্রণাম
আসরে বন্দনা করি দশ ঠাকুরের চরণ
শুন শুন তোমরা দশজন এই আসরে
গাওনা হবে আধিয়ার বিদ্রোহ
(তে-ভাগা আন্দোলন)
হরিহরের বিচার
সর্বশিক্ষয় আন্দোলন

বিভিন্ন 'খন' পালার বন্দনা বিভিন্ন প্রকারের হয়। খন পালা বেশ পুরানো। তবে যেহেতু এ পালা প্রতি বৎসরই সাময়িক ঘটনা নিয়ে উপস্থাপিত হয় তাই এর মধ্যে প্রাচীনত্বের বিশেষ কোনো লক্ষণ নেই। এর ভাষা

এবং বিষয়বস্তু নিত্য পরিবর্তিত। 'খন' লোকনাটকের বিদগ্ধ পরিচালক শ্রী খুশীমোহন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে বাংলাদেশে রামায়ণ গানের প্রচলনের সময় থেকেই এই 'খন' গান চলে আসছে। লোককবি বা লোকনাট্যকারের সৃজনী শক্তির দ্বারা খন গান রচিত হয়ে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে রাজবংশী ও অন্যান্য লোকসম্প্রদায়ের অমূল্য সৃষ্টি এই খন। 'খন' যেহেতু গ্রামীণ জীবনে সংঘটিত কোনো ঘটনার রূপায়ণ বিশেষত অবৈধ প্রণয়জনিত কাহিনী — কাজেই এর বিষয়বস্তু কখনো এক থাকে না। প্রতি বছরই কিছু না কিছু নূতন বিষয় নিয়ে এই পালা নাটক রচিত হয়। পুষ্পজিৎবাবু এরকম কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যেমন নয়নশরী জামালউদ্দীন খাঁর ফাঁসি, কারেনশরী, যম বাউদিয়া, বৌদির চক্রান্ত, দুরাচার জমিদার, অসভ্য চেয়ারম্যান, পয়মালশারী, বিনোদ-বাসন্তী, সাইকেশরী, তেভাগা ইত্যাদি। সংখ্যাটা অনেক। এইসব বিষয় গ্রামীণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জীবন্ত বিষয়। বর্তমানে খন গানকে লোকশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সর্বশিক্ষা আন্দোলন, সাক্ষরতা ইত্যাদির কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগে যা ছিল প্রণয়মূলক কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ এখন তা নিয়ন্ত্রিত আকারে লোকশিক্ষার কাজে প্রযুক্ত হচ্ছে। গ্রামীণ লোকনাট্যের একটা বৈশিষ্ট্যই হল এই যে তাতে লোকশিক্ষা ও লোক মনোরঞ্জন দুইই করা হয়। সেদিক থেকে লোক শিক্ষার উপরে বর্তমান জোর পড়েছে। পুরুষ-নারীর আপত্তিকর প্রেম-ভালোবাসা নিয়েই 'খন' লেখা হয়। গানের ভিতর দিয়ে পুরুষ-নারীর আপত্তিকর বা অসামাজিক কর্মকে সাবধান বা সতর্ক করে দেওয়া হয়। বর্তমানে 'খন' পুরুষ-নারীর ভালোবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের যত ধরনের ক্রিয়া কলাপ রয়েছে সবকিছুকে নিয়ে গান রচিত হয়। কথায় কথায় গান তৈরী হয়। সুরপ্রধান এই গানগুলি অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা পরিবেশিত হয়। বর্তমানে সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জমি অধিগ্রহণ, ভাগচাষ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলত: 'খন' গানের রচয়িতারা এই জাতীয় গান রচনা করে উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন।

হরিহরের বিচার, তে-ভাগা আন্দোলন, ইত্যাদি বিষয়গুলো যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ যতই এই গানের বিষয়বস্তু হোক না, কেন অবৈধ প্রণয়-কাহিনীই এর মূল উৎস।

পূর্বেই বলা হয়েছে 'খন' গান পরিবেশনকালে সাধারণ দর্শকের প্রায় সঙ্গেই অভিনেতারা মঞ্চে অভিনয় করে থাকেন। সাধারণ আলোয়, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদে এবং অল্প মেক-আপে চরিত্রগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। হালুয়া-হালুয়ালী এই জাতীয় পালার প্রয়োজনে জীবজন্তুর আদল বোঝাতে মুখোশের ব্যবহার হয়।

সাধারণভাবে এই গান শীতকালেই বেশী পরিবেশিত হয়। তবে বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপানায় যে কোনো সময় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গ্রাম-গঞ্জে গৃহস্থের আঙ্গিনায় দীর্ঘক্ষণ ধরে 'খন' গান নবান্নের সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লক্ষ্মপূর্ণিমাতে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে 'খজাগর' নামে এক গান-উৎসব অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। বহুকাল আগে 'খন' গানও ঐ সময়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে করা হয়ে থাকতো। এছাড়া মানুষের চাহিদার উপর 'খন' গান রচিত হয়ে থাকে।

নির্বাচিত সংকলনের 'খন' লোকনাটকটির নাম 'হরিহরের বিচার'। রচনা করেছেন খুশী সরকার। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তৈরী হয়েছে এই খন। কৃষক পরিবারের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে গেলে অনেক সমস্যা। সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা-চেতনার অভাব। এই 'খন'-এর বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয়েছে আটটি দৃশ্যে। নাটকে পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা ছয়টি এবং নারী চরিত্র একটি। প্রথম দৃশ্যে সবুজ, বেঙ্গু, অভয় ও জগাই প্রবেশ করে। সবুজ একজন যুবক। গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য। সবুজ প্রবেশ করেই বলে — শিক্ষা মানুষের অধিকার। সেই অধিকার অর্জন করিবা হইলে হামাক ইসকুলত যাবা হবে, ছায়ালাক ইস্কুল পাঠাবা হবে।''

সবুজের কথায় বেঙ্গু ও অভয়ের গভীর আস্থা। অভয় গ্রামের সঙ্গীত শিল্পী। তাই গান গেয়ে ওঠে —

শুনেন শুনেন দাদাগণ
শুনেন শুনেন বৌদিগণ
লেখা-পড়া করিতে ইসকুলে
পাঠান সবে বাচ্চাগণ।
ও দাদাগো ও বৌদিগো
তোমার ৫ থেকে ৯ বছরের ছেলে মেয়ে
পাঠাও সবে ইসকুলে।
এবার VEC ডাক দিয়েছে।

সাক্ষরতা অভিযানকে সফল করার জন্য এই গানের প্রচার। গ্রামে গ্রামে এখন Village Education Committee (VEC)। তাই এটি 'খন' গানেও প্রতিফলিত। গ্রামের বিদ্যালয়ের ঘর-দরজা, আসবাবপত্র নতুন করে করা হচ্ছে। সেই কাজগুলোতেও জগাই মহাজনের খারাপ নজর। তাকে সাবধান করে দেয় গাঁ-এর কৃষক বেঙ্গু। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় হরিহর, দুর্গা ও সবুজকে। কৃষক হরিহর লাঙ্গল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে মাঠে যায়। যাওয়ার সময় গানের ভেতর দিয়ে স্ত্রী দুর্গাকে বলে—

ওনা সকালে উঠিয়া মুই
যাছু হালখান ধরি
তাড়াতাড়ি ওরে চেতনার মা
তুই যাইস খরাক দিবা।
ওনা সঙ্গে দুটা পিয়াজ নিগাবু
আর নিগাবু আলুর ভাজা
এক দুফুর বেলা হইলে —
ওরে চেতনার মা
ও মোক ভোগ নাগে চন চন করিয়া।

হরিহরের স্ত্রী দুর্গা চেতনার মা। সে নামে না ধরে চেতনার মা বলে সম্বোধন করছে। দুপুর হলেই তাকে ক্ষুধা লাগে। দুর্গাকে মাঠের মধ্যে খাবার নিয়ে যেতে হবে। কৃষক-বাড়ীর এই দৃশ্যটি নাটকে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

হরিহরের অনুপস্থিতে শিক্ষা কমিটির সদস্য যুবক সবুজ দুর্গাকে শিক্ষার উপযোগিতা বোঝায়। এখানে দেখা যাচ্ছে দুর্গা সবুজকে ভাশুর বলে সম্বোধন করে। সবুজ দুর্গাকে ভাউসান বলে। 'খন' লোকনাটকে প্রায় প্রত্যেকটিতেই 'ভাশুর ভাউসান' সম্পর্কের কথা দেখতে পাওয়া যায়।

সবুজ দুর্গার মেয়ে চেতনাকে স্কুলে পাঠানোর কথা বলে। দুর্গা সবুজকে নানান সমস্যার কথা বলার সময় চতুর জগাই প্রবেশ করে। সবুজ-দুর্গার কথপোকথনের উপর জগাই একটা আপত্তিজনক সন্দেহ তৈরী করে নেয়। সবুজের উপর দৃষ্টি রেখে আপনমনে বলে — "ওহো প্রেম জামিয়া ভালয়। প্রেম করা তোর ভাকরোছ, সবুজ মেম্বার। ওদিন তোর জন্য অপমান হনু। অপমানের শোধতো মোক নিবার হবে।" দুর্গা হরিহরের দুপুরের খাবার নিয়ে তৃতীয় দৃশ্যে মাঠে আসে। হরিহর দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং রেগে বলে — 'এত বেলায়। তমার একটা জ্ঞান আছে অত করি কহি আসিনু। দিম নাকি হাল বহা পানঠিখান দি ঝরঝরাই।'

দুর্গা — 'মারনিতে। মাইর ছাড়াত কিছু বুঝেন নি। সকালে বাসি কাম কি কম থাকে। ছাগললা বান্ধিনু। গাইটাক ঘাস খাবা দিনু। ভাত আন্দিনু। আলু ভাজিনু। তারপরত আসিনু। ধরধর এক্ষুনে হোচট খাই পরি গেনুহুই।'

একজন কৃষকের বৌ-এর নানা কাজ এখানে বর্ণিত। দুর্গার যুক্তিতে শান্ত হয়ে খেতে বসে হরিহর ছেলে ও মেয়েদুটোর খবর শুনে চট করে রেগে ওঠে।

হরিহর — হা, কার হুকুমে ইসকুলত পাঠালু। এত কাম ইলা কে করিবে।

দুর্গা — মুই নিজে পাঠানু। কিতে গাও শিক্ষা কমিটির মেম্বার ভাশুরটা কহিবা আসিয়াল সব ছুয়াক ইসকুলত পাঠান হবে।

হরিহর — মোর বেটাবেটি ইসকুলত যাবে, না নি যাবে মুই বুঝিম। সনাতনক পাঠালে হল হয়। বেটিটা পাঠালে কেনে ?

হরিহর ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে রাজী। কিন্তু মেয়েকে পাঠানোর কোনো যুক্তি দেখে না। কিন্তু দুর্গাও নাছোরবান্দা।

দুর্গা — মুই কহচু যাবে বেটি মোর ইসকুলত যাবে।

হরিহর — এই চুপ। মোর উপরে কাথা।

দুর্গা — চুপ করিম কেনে মোর বেটাবেটি ইসকুলত যাবে।

হরিহর ভীষণ রেগে উঠে দুর্গাকে বেশ জোরেই মারে। দুর্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

এখানে দুর্গার গানই সংলাপ হয়ে উঠেছে।

— ছুয়ার নেখাপড়ার দোষে
ও স্বামীধন মোকে মারিলেন
শিক্ষার কি মূল্য স্বামীধন
কেমনে জানিবেন।
ওনা - কুমার শালে মাটি শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ হয় চাষ দিলে
বিদ্যালাভে মানুষ শুদ্ধ হয় সুয়ামী
শাস্ত্রে নেখা আছে।

দুর্গা ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাবেই। সবুজ মেম্বারের চেতনার দ্বারা সে প্রভাবিত। পরের দৃশ্যে দেখা যায় জগাই হরিহরকে ঠাট্টা করে। হরিহরের মনে নানা সংকট। জোর করে মেয়েকে স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। মেয়ে চেতনা জগাইয়ের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করবে বলে হরিহর আগেই টাকা নিয়েছে। সে কোনো কিছু সামলে উঠতে পারে না। তার মধ্যে পিওন একটা চিঠি নিয়ে আসে। সেই চিঠি নিয়ে জগাই মহাজনের কাছে গিয়ে জানতে চায় চিঠিতে কী লেখা আছে। গ্রামের মহাজন জগাই হরিহর কৃষকের বাড়ীর ভেতরের যাবতীয় ঘটনাকেই প্রভাবিত করে। গ্রামের এই লোকগুলোকে দুঃস্থ কৃষকদের এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না। চিঠি পেয়ে হরিহরের

সন্দেহ হয়। দুর্গা কারো প্রেমে পড়েছে কি না। জগাই-এর কাছে মেলে ধরে চিঠি। সবুজ মেম্বার হরিহরকে চিঠি দিয়েছে। বিনা কারণে কেন সে তার স্ত্রীকে মারধোর করেছে। কেন ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না — এই বিষয় নিয়ে গ্রাম শিক্ষা কমিটিতে হরিহরের বিচার বুধবার বেলা দুটায় হবে। সবুজ মেম্বারের চিঠি পেয়ে হরিহরের আরো দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। এই অপমান থেকে একমাত্র দুর্গাই তাকে রক্ষা করতে পারে।

সবুজ মেম্বারের এই সকল কাজকর্ম মহাজন জগাই-এর একদম পছন্দ নয়। জগাই মহাজনের সঙ্গে যুক্ত হয় আর একজন মহাজন। তার নাম ভুচিয়াল। উভয়ের কথপোকথন শোনা যেতে পারে —

ভুচিয়াল — মানুষের মুখে কানা-ঘুষা মহ শুনুহ। কাথাটা তাহলে সত্যি দাদা, গাও শিক্ষা কমিটি হরিহরের বিচার ডাকিয়া বিচার হইবে।

জগাই — সত্যি মানে? ইতিমতন নটিশ করিয়া। কি দোষ, না ছুয়া ইস্কুলত পাঠায়নি। তার বহুক ধরি মারিয়া। বহু কাথা যদি না শুনে। এরকম হামার ঘরত কত হয়।

ভুচিয়াল — যতসব ভুঁই-ফুটা দেউনিয়া। মোর বাড়িত দিন-আইত অত্যাচার নাগায়। কি তাংনি জানিস, মোর বাড়িত এতনা নেংগেরা বেটি ছে — তাক ইস্কুলত পাঠাবায় হবে — তার নাকি পড়াশুনা করা বেশী দরকার। ইলা ফের কাথা কহয়।"

শেষপর্যন্ত জগাই ও ভুচিয়ালের কোনো মতামতই ঠেকে না। সাক্ষরতা আন্দোলনে সকলকেই স্কুলে যেতে হয়। নাটকের শেষে এসে দেখা যায় সবুজ, বেঙ্গু হরিহর, দুর্গা চেতনা এবং আরো অনেকে মিটিং-এ বসেছে। সেখানে হরিহরের বিচার শুরু হয়।

হরিহর বলে — মোর কোন দোষ নাই দশঠাকুরলা। ওই মোর কাথা শুনেনি। মুই কহচং, উয়াই কহচে, আর একটা উত্তরা-উত্তরি। তাতে মোর মাথা গরম হইল। আর একটা কাম করিয়া, মোক না কহি বেটিটাক ইসকুলত পাঠায় আ। ওই তাংনে আর কোনদিন এনং হবা নাহা। দশ ঠাকুরলা মোক ক্ষমা কর। কড়জোরে তোমার ঠিনা ক্ষমা চাহাচং।

দুর্গা — দশঠাকুরের ঠিনা মোর অনুরোধ, চেতনার বাপক উচিত শিক্ষা দে। বিনা কারণে মাঝে মধ্যে এইভাবে মোক মারধোর করে। কোনদিন তাস-জুয়া খেলাই, মদ খাই আসি মাতলামি করে আর মোক ধরি মারে। বেটা-বেটিলাক ইসকুলত পাঠাবা চাহোনি। বিনা কারণে মোর দোষ বাহির করে।

গ্রামের দশজনকে নিয়ে বিচার ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই প্রচলিত। গ্রাম শিক্ষা কমিটি বিষয়টি মিটিয়ে দিয়ে

হরিহরকে শিক্ষানুরাগী করে তোলে। বর্তমান শিক্ষা-প্রসারের আন্দোলনটি এখানে স্থান পেয়েছে। নাটকটি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়। সেই উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপিত করে দেখানো হয়। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সবাই শেষে একসঙ্গে গান গেয়ে ওঠে।

আধারে জ্বালিয়ে আলো।
গাওবাসী শিক্ষার দিকে এগিয়ে চলো।
মানব মন্দিরে জ্বালো শিক্ষার আলো।

নাটকে চরিত্রানুযায়ী মেক আপ, পোশাক পরিচ্ছদ, সংলাপ ব্যবহার সবকিছু মধ্যে একটা শক্ত বাঁধন আছে। নাটকটি শুরু হয়ে দ্রুত গতিতে শেষ হয়। উচ্চারণ আঞ্চলিক হলেও স্পষ্ট করে বলার অভ্যাস দেখা যায়। বিষয় বহির্ভূত গান বা সংলাপ নেই। এই 'খন' পালা নাটকটির উপর মনে হয় আধুনিক নাটকের প্রভাব আছে। 'খন' গনা রচনা কখনো থেমে থাকে না। রচয়িতারা সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে খন রচনা করেন। বহুদিন আগের কিছু 'খন' গানের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অতিথিদের সেবা-যত্ন করা গ্রামে প্রচলিত নিয়ম। বাড়ীতে অতিথি এলে হাত-পা ধোয়ার জল দেওয়া হয়। অতিথিকে সম্মানে খাওয়ানো হয়। এরকম একটি বিষয় নিয়ে 'খন' গান আছে। 'তিতোসরী' খন গান। 'তিতোসরী' খন গানে মা তার মেয়ে তিতোসরীকে অতিথি সেবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। —

'কি করহেছিস তিতো বেটি
ঘরতে বসিয়া
বহুদিনের পরে তোর ভাশুর
আসলে বেড়াবা।
পান দে বেটি বিড়ি দে
আর দে বেটি বসিবা
তাড়াতাড়ি ওলো বেটি
চরণ সেবা করা।'

কাহিনীতে জানা যায় তিতোসরী বিধবা। বৈধব্য নিয়ে কাটায় বলে মনে কেটা দুঃখ রয়েছে। ভাশুরের সেবা-যত্নের জন্য জল নিয়ে আসে। নিজের দুঃখের কথা গানের ভেতর দিয়ে বলছে —

''নেহ ভাশুর
চরণ সেবার জল
বহু দিনে সোয়ামী মরা

মন বড় চঞ্চল।

কপালে ছিল ভাশুর

এ দুঃখ লেখা

কাচা-চুলে সোয়ামী মরা

মন হচ্ছে উতলা।''

আর একটি পুরনো 'খন' গানের নাম 'চৌদ্দ পাঠুয়ার খন' পরস্পর আত্মীদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা চলছে। দুই বেয়াই মশায়ের সম্পত্তির গর্ব। ফলে একটু কিছু হতেই আদালতে গিয়ে একজন আর একজনের বিপক্ষে মামলা করে দেয়। একে অপরকে জব্দ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। গ্রামের লোক এই নিয়ে বেশ মজা করে। এই মামলায় দুটি পরিবারই আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তুলনামূলক গরীব বেয়াই মশায় মামলা তুলে নিতে চায়। এতে অবস্থাসম্পন্ন বেয়াই সুযোগ পেয়ে যায়। চৌদ্দ পাঠুয়ার 'খনে' দুই বেয়াইয়ের গানে ফুটেছে সেই চিত্র। গরীব বেয়াই বলছে — মামলা উঠান বেহাই

হবে সম্মানের হানি

ধনী বেয়াইয়ের উত্তর — জীবন থাকতে ওহে বেহাই

মামলা উঠামনি।

উল্লেখিত 'খন' গান দক্ষিণ দিনাজপুরে কুশমণ্ডীর 'খন' রচয়িতা শ্রী খুশীমোহন সরকারের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ঘটে যাওয়া ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে 'খন' গান প্রচুর লেখা হয়েছে। ডক্টর শিশির মজুমদারের উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য গ্রন্থে বেশ কয়েকটি খন গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকোশোরী, সুমিতা যোগীর গান, মায়্যা বন্ধকী, নয়ানশোরী, বর্মোশোরী[১৬] — এই 'খন' গানগুলিতে আছে সমকালের চিত্র। 'আমিনা-ঝালুয়া' বলে অতি পরিচিত পুরনো একটি খন গান পাওয়া যায়। বয়স্ক ব্যক্তিদের মুখে মুখে এই পালার নাম শোনা যায়। ঝালুয়া প্রেমিকের নাম। আমিনা প্রেমিকা।

ঝালুয়া প্রেমিকা বলছে —

দেখেক আমি না

দুনিয়ার কল

তোর রূপে দেখিয়া

মুই হইনু পাগল

তিন চাকায় চলে

আমিনা রিক্সার গাড়ী

মটর করেছে আমিনা

দৌড়াদৌড়ি

খুটার উপর লহার বাতি

চল।

এই খন গানটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চান্দইল গ্রামের শ্রীমন্ত সরকারের রচনা। অবৈধপ্রেম নিয়ে খনের রচনা বহু। ছোট ভাই-এর বৌ-এর কাছে বড় ভাই-এর প্রেম নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা 'খন' গানে দেখা যায়। 'শিতলসরি' খনে তা দেখানো যেতে পারে

ভাশুর বলছে — ভাউসান তমারি আশা

যদি করান ভালবাসা

কতই নিবেন শাড়ি বাটি

কতই নিবেন গাহানা

তমাকে না দেখিলে ভাউসান

থাকিবার পারুনা।

এবার ভাউসান গদ্য সংলাপে বলে —

— ঐলা শরমের কাথা বড় হয়া কেনং করি হামাক কহাচন। ঐলা কাথা হামাক কহান না। মানষি জানিলে কলংক উঠিবে। তাইলে হামার একটা কাথা শুন —

তমরায় হবেন বড় ভাশুর

হামরায় ছোট ভাউসানী

প্রেম পিরীতির কাথা কহিতে

ভাশুর শরমে করাননি।

ভাশুর — প্রেম পিরীতির কথা কহিতে ভাউসানি কিসের শরম। তমাক না চাহাচে হামার মন। হামার একটা কাথা শুন।

ভাউসান — কানে দিম তোর কান মাকিরি।

অলংকারের কথা শুনে ভাউসান বলে — ঠিক কহাচন ও ভাশুর, না হামাক খালি নষ্ট করিবা চাহাচেন। হামরা যা যা চাহিম সব পাম। হায়রে মোর কপাল।

ভাশুর — হে ভাউসান সব পাবেন।

(শ্রী নির্মল সরকারের রচিত এই খন গান। এই গানগুলি শ্রী খুশী মোহন সরকার সংগ্রহ করেছেন।

পৌষ ১৪১০, ডিসেম্বরের ২০০৩ সালের 'লোকশ্রুতি' পত্রিকাতেও খুশীমোহন সরকার এই খন গানগুলির কিছু কিছু উল্লেখকরেছেন।

সামাজিক আন্দোলনের বিষয় নিয়ে বর্তমানে বেশী করে 'খন' গান রচিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 'খন' উদ্যোগেও তৈরী হচ্ছে। পরাধীন ভারতবর্ষের তেভাগা আন্দোলন নিয়ে একটি 'খন' রচিত হয়েছে। এই কনের রচয়িতা খুশীমোন সরক'র। এই খনের বিষয়বস্তুতে আছে কৃষকের উৎপন্ন ফসলের তি নভাগ আদায়ের লড়াইয়ের কথা। জমিদার তহশিলদার, মহাজনদের অত্যাচারকে সহ্য করে কৃষক তার আন্দোলনে সফল হয়েছে নিয়ে খন। গ্রামে ঘটে যাওয়া কলংকের কাহিনীই একদিন খন গানের বিষয়বস্তু ছিল। বিশেষ করে অবৈধ প্রেম। সেই অবৈধ প্রেমের চিত্র বা চিত্রাভাস প্রত্যেকটি 'খন' গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'তে-ভাগা' আন্দোলনের কাহিনীতেও দেখতে পাওয়া যায় মহাজন গৃহস্থের বৌ-এর সঙ্গে সুযোগ বুঝে প্রেম করার চেষ্টা ঋণে জর্জরিত গৃহস্থের বৌ মহাজনকে ভাশুর সম্বোধন করছে —

ফুলন — ওই ভাশুর তমরা আসিয়ান। আইস আইস বাড়ীর ভিতর আইস। হায়রে কপাল। ভাশুর তোমার খাটো পা খান আইজ নাম্বা হইল। হামার কি কপাল।

হান্ডিয়া মহাজন — ভাউসান, তোমাক একটা কাথা কহিবা আসিন। যদি শুনেন তে কহি।

ফুলন — কহিয়া আসিয়ান। কহ। শুনি কি কাথা। হান্ডিয়া মহাজন (গানের মধ্য দিয়ে বলে) —

ও না শয়নে স্বপনে ভাউসান
দেখু তমার ছবি
তমাক ছাড়া ও ভাউসানী
মোক ভায় নাগেনি
তমরায় সাজ ফুল ভাউসান
হামরা সাজি ভাউসান ভমরা
মনের সুখে মধু খাম ভাউসানী
তমার ঐ ফুলে বসিয়া

তে-ভাগার রয়েছে অবৈধ প্রেমের কথা। আধুনিককালে যে 'খন'ই রচিত হোক না কেন প্রচ্ছন্নভাবে তার ভেতরে এই 'প্রেম' বস্তুটি থেকে যায়।

রাম-বনবাস

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি প্রাচীন লোকনাটক রাম-বনবাস। কুশমণ্ডী, বংশীহারী, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ এলাকায় রাজবংশী পালিয়া গোষ্ঠীভুক্ত সমাজের মধ্যে এই নাটকের প্রচলন। এই অঞ্চলে কীর্তন, রামমঙ্গল গান, বিষহরা বা পদ্মার গীতেরও প্রচলন রয়েছে। তার পাশাপাশি ভক্তিমূলক লোকনাটক রাম বনবাস প্রচলিত।

রাম বনবাসের বিষয়বস্তু রামায়ণের কাহিনী আশ্রিত। অযোধ্যা কাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত এর বিষয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। অযোধ্যা থেকে লঙ্কা কাণ্ডের প্রত্যেকটি অংশের কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করে নাটকের রূপে রাম বনবাস পরিবেশিত হয়।

এই লোকনাটকে অরণ্য কাণ্ডের চাইতে লঙ্কা কাণ্ডের কাহিনীই বেশী পরিলক্ষিত। রামের বনবাস থেকে রাবণবধ পর্যন্ত এর মধ্যে কাহিনী। এই কারণে লোকনাটকটির নাম 'রাম বনবাস'। মূল গায়কদের কাছে প্রশ্নটি উত্থাপন করে এরকম উত্তরই পাওয়া যায়। 'রাম বনবাস' — এই নামকরণ পূর্ব থেকেই প্রচলিত। হালে এই নামেরও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

এই লোকনাটকটির মঞ্চ সজ্জা অতি সাধারণ। খোলামাঠে মঞ্চের মধ্যে বাদ্যকারদের বসার ব্যবস্থা থাকে। তাদের ঘিরে অন্যান্য অভিনেতারা বসেন। মঞ্চের চারদিকে দর্শকরা থাকেন। খোলামঞ্চের চারিদকে বাঁশের খুঁটি এবং উপরে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়। মঞ্চের একদিকে রামচন্দ্রের একটি সিংহাসন থাকে। এই সিংহাসনটিকে পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করা হয়।

অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছদ চরিত্রানুযায়ী মূল গীদাল সাদা ফতুয়া এবং ধূতি পরেন। হাতে একটি চামর থাকে। অভিনয়ে রাবণের দশমাথার মুখোশটি সবচাইতে বড়ো। সূর্পনখা, খর, দূষণ, মহিরাবণ, হনুমান, জটায়ু, নল, নীল, অঙ্গদ — এই চরিত্রগুলির প্রকৃতি অনুযায়ী মুখোশ তৈরী হয়। গ্রামীণ কাঠ-শিল্পীরাই মুখোশ তৈরী করেন। নর-বানর-রাক্ষস এই তিন শ্রেণীর গোষ্ঠীর পার্থক্য বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পোশাক ও মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়। লোকনাটকটিতে রয়েছে বহু চরিত্রের উপস্থিতি।

দুর্গা পূজা, কালী পূজা, হরি পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই লোকনাটক। বর্তমানে সরকারী অনুষ্ঠানে এবং বেসরকারী সংগঠনের অনুষ্ঠানেও 'রাম বনবাস' মঞ্চস্থ হয় তবে খোলা মাঠে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা এই সকল অনুষ্ঠানে থাকে না। গ্রামীণ পরিকাঠামোর মধ্যে পুরনো আঙ্গিককেই ধরে রেখেছে রাম-বনবাস। গম্ভীরা, খন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। তাই পরিবর্তন চোখে পড়ে। কিন্তু রাম বনবাস প্রচলিত আঙ্গিকের

মধ্যেই থেকে গেছে।

মূল গীদাল আসরে দাঁড়িয়ে দর্শক-শ্রোতাদের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে অনুমতি প্রার্থনা করে জানতে চান রাম বনবাস পালার কোন অংশটুকু তাঁরা আসরে মঞ্চস্থ করবেন। সময়ের বাধা না থাকলে রামের বনবাস থেকে শুরু করে সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত অভিনয় চলে।

রাম বনবাস পালা নাটকে প্রথম দৃশ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের কথোপকথন। লক্ষ্মণকে রাম রাজ্য ছেড়ে যেতে নিষেধ করছে। ঠিক সেইভাবে সীতাকেও রাজ্য ছেড়ে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে।

রামের কথা — শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে যাব আমি বন।
পিতা-মাতা ভাই সহ থাক একস্থানে।
চৌদ্দ বৎসরের জন্য যাব আমি ঐ অরণ্য কাননে।

সীতাকে রামের যুক্তি —

'সীতা, সীতা। চৌদ্দ বৎসর বনবাস দারুন যন্ত্রণা, নারিবি সহিতে প্রাণে। তার চেয়ে থাক তুমি, হেথায় গৃহ মাঝে, মাতৃসেবা কর তুমি আনন্দিত মনে।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বিদায়ের পরেই কিষ্কিন্ধ্যানগরের দৃশ্য ভেসে ওঠে। বালি, সুগ্রীব ও তারা প্রবেশ করে। দানবকে বধ করার জন্য বালি পাতালে যায়। রাজ্যের প্রজাগণ রাজার অভাবে বড়ই কষ্টে পড়ে। বড় প্রজা, ছোট প্রজা, কানা, কেরাণী এই রকম বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক আলোচনায় লোকায়ত জীবনের কথা ফুঠে ওঠে। কিষ্কিন্ধ্যানগরের এক কেরাণী বলছে — আরে বাবা তোমাদের হল কি! এই অফিসে এসে চিৎকার করছ কেন ?

প্রজা — 'চিৎকার করছি কেন? দেশে খুব দুর্ভিক্ষ পড়েছে। তাই এসেছি কিছু সাহায্যের জন্য। আমাদের কিছু সাহায্য দিন।'
রাজার অনুপস্থিতে রাজ-প্রশাসনে ঘটেছে বিশৃংখলা। প্রজারা তাই সবাই মিলে সুগ্রীবকে রাজা বানিয়ে দেয়। কেটা নির্বাচনের কথা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রজা — 'শুনেন কেরাণী সাহেব। পাতালে গেলে মানুষ আর ফিরে আসতে পারে না। একন এক কাজ করি, আমরা সকল প্রজা মিলে তাহাকে রাজা সাজিয়ে দিই।'

কেরাণী — 'ছোট রাজকুমার আপনার দাদা পাতাল থেকে আর ফিরে আসবে না। তাই আমরা সকলে প্রজা

মিলে আপনাকে রাজা সাজিয়ে দিই। আর আমাদের কিছু সাহায্য দিয়ে দিন।'

লোকজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অভাব পূরণের কথাগুলো নাটকের মধ্যে দেখা যায়।

অন্যদিকে বনের মধ্যে সূর্পনাখার বিবাহের ইচ্ছাকে রাম-লক্ষ্মণ প্রত্যাখ্যান করে। তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সূর্পনখারই নাক-কান কাটা পড়ে। লঙ্কাপুরীতে এ খবর পৌঁছে গেলে রাবণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। মারীচকে রাবণ অনুরোধ করে মায়ারূপ ধারণ করে রামকে ছলনা করতে যাতে সে সীতা হরণ করতে পারে। রাবণ এখানে গীতের মধ্যে মারীচকে বলছেন —

হস্তে ধরি পায়ে পড়িরে মামা, করি নিবেদন। ওহে মায়ামৃগ বেশে যাহ কুটীরের পাশে। সোনার বরণ দেহখানিরে মামা, রূপার মস্তকখানিরে। নাচিতে নাচিতে যাহ কুটীরের পাশে ওহে। তুমি যাহ আগে আগেরে মামা, আমি যাব তোমার পিছেরে মামা হরিব জানাকীরে।

এই অংশে নাটকে মামা-ভাগ্নের সম্পর্ককে খুব নিকট করে দেখতে পাওয়া যায়। রাবণ ছদ্মবেশে সীতার কাছে ভিক্ষা চাইতে গেলে সীতা বলে —

শুনহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আমি বলি তোরে।
কি দিয়ে বুঝাব তোমায় অন্ন নাহি ঘরে।

তখন রাবণের গীতের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে এলাকার মানুষের বারমাসের জীবনযাত্রার চিত্র।

রাবণ —

ওরে আমার কপালে ভিক্ষা হল নারে।
বৈশাখ মাস ধর্মমাস ভগদই ছিটাছিটি।
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম, খাইতে বড় স্বাদ।
আষাঢ় মাসে অনাবৃষ্টি, বিনা মেঘে কাছ।
শ্রাবণ মাসে ঘন মেঘ চুয়ায় পড়ে ব্যাঙ।
ভাদ্রামাসে মনসা পূজা, জলে ভুরা ভাসে।
আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, ঘরে ঘরে জুলে।
কার্তিক মাসে কালি পূজা পাঠা বলিদান।
অগ্রাহণ মাসে নতুন ধান ঘরে ঘরে নবান।
পৌষমাসে পৌষ আলো চিড়ায় লেপন।
মাঘ মাঘে মাখি জার ঝাপ টানানি।
ফাল্গুন মাসে দোলের চাঁদ রং ছড়াছড়ি।

চৈত্রমাসে চৈতা কালী ঠাকুর মেলা লাগে।

বারো মাসে তের চাঁদ সর্বলোকে জানে।

বারো মাসে তের চাঁদ গেলরে চলিয়া।

বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রকৃতির বর্ণনা লোকনাটক রচয়তিার ভাবনায় ফুটে উঠেছে। বৈশাখে 'ভগদই ছিটাছিটি' বলতে ধর্মমাসে পূজার প্রসাদের কথা বোঝাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠের পাকা আম, আষাঢ়ের অনাবৃষ্টি, শ্রাবণের মেঘ, ভাদ্র মাসের মনসা পূজা, আশ্বিনের দুর্গা, কার্তিকের কালী অঘ্রায়ণ মাসের নবান্ন, পৌষের আতপ-চিড়ে, মাঘের ঠাণ্ডা, ফাল্গুনের দোল, চৈত্রের লৌকিক চৈতা কালীর পূজা — এই সব কিছুর বর্ণনা রাবণের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোথাও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ বেশী ভিক্ষুক রাবণ এখানে সাধারণ অভাবগ্রস্ত মানুষ হিসেবে চিত্রিত।

সীতাকে হরণ করে রাবণ অশোকবনে রেখে দেয়। হনুমানের সীতা সন্ধান দৃশ্যে লৌকিক ও সামাজিক জীবনের কথা পাই।

সীতা — বাবা হনুমান আমি তোমায় কি খেতে দিব, একটি ফল খাও বাবা।

হনু — মা সীতা, একটা ফলে আমার উদর পূরণ হবে না। এই ফলের বাগান কোথায় আছে মা।

সীতা — ওইযে বাবা ফলের বাগান, তুমি গিয়ে ফল খাও। রাবণ শুক-সারণকে দায়িত্ব দেয় বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য। শুকের কথা — মহারাজ, বাগানতো পাহারা দিতে যাবো তাহলে আমাকে কিছু চিড়া মুড়কি খেতে দিন।

নাটকের গতির সাথে চরিত্রগুলি কখনো কখনো খুবই সাধারণ হয়ে ওঠে। দর্শকদের আর্থ-সামাজিক জীবনের সঙ্গে অভিনেতাদের জীবন জড়িত। ফলে বিষয়বস্তু রামায়ণের হলেও লোকসমাজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। ফলে নাটকের গতি কখনো ঢিলে হয়। তবু শ্রোতাদের আকর্ষণ কমে না। রাম রাবণের যুদ্ধে রাবণের প্রধান প্রধান সৈন্য নিহিত হলে তরণী সেনকে রাবণ আহ্বান করছে। আহ্বানে রাজী হলে সরমার পুত্রকে যেতে দিতে চায় না। সরমা গীতে পুত্রহারা মায়ের বেদনা —

যেও না যেও না বাপরে ও বাপ

নর বানরের রণে

নর বানরের রণে গেলে বাচিব না প্রাণে।

পুত্র তরণী গীতের মধ্য দিয়ে বিচায় চায় —

বিদায় দাও বিদায় দাও গে মাতা
বিদায় দাও হে মোরে
রণ করিতে যাব ওগো মাতা শ্রীহরির সনে।

যুদ্ধে লঙ্কার বীরদের নিধন সংবাদ রাবণের কাছে শুক পৌঁছে দেয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দূত মুখে রাবণ সংবাদ পান। এই লোকনাটকে শুক দূতের ভূমিকা পালন করে। এই নিধন সংবাদ পরিবেশনে শুক কখনো সিরিয়াস হচ্ছে আবার কখনো হাল্কাভাবে কথা বলছে।

শুক — মহারাজ, আপনার তরণী সেন বীর রণে পতন।

রাবণ — একি শুনালে শুক মোরে। তরণী সেন বীর মোর গেল যম ঘর। যাও পুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে এস আমার সম্মুখে।

যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পতন হলে শুক এসে রাবণকে সংবাদ দেয়।

শুক — মহারাজ মহারাজ, আপনার ইন্দ্রজিৎ পুত্র একেবারে মর গিয়া।

নাটকে রাবণের কাছে দুঃখের খবর শুক দূতরূপে এরকম ভাবে পৌঁছে দেয়।

রাবণ দুঃখে গীত গায় —

কি হল, কি হল বিধিরে এ বিধি আমার কপালে
দেবীর পূজিতে মহি গেল যম ঘরে
মরেরে সোয়া লক্ষ নাতী
এক জন না রইল, বংশে দিতে বাতি।

এই গীতে রয়েছে রাবণের বেদনা। রাবণের 'মৃত্যুবাণ'-কে উদ্ধার করার জন্য মন্দোদরীর সঙ্গে হনুমানের কথোপকথন অতি সাধারণ। গ্রামের পুরুষ ও মহিলার বাক্য বিনিময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

জ্যোতিষী — হনুমানকে মন্দোদরী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ বাবা, আচ্ছা বলতো বাবা ফুল দুটি কি ?
কোন ফুলটি জয় আর কোন ফুলটি পরাজয় ?

হনুমান — বগাটা কালো। বগিটা ধলা। আর এই বাড়ীর উপর দিয়া মহি চক্র চলে গেল। আনতো মা চাল ডাল কুমড় বড়ি। ঐ পুকুরের জালে মাছ ধরি। মা, আমার গণনা হয়েছে। আপনার দক্ষিণ হস্তে জবাফুল আর বাম হস্তে গোলাপ ফুল। বামহস্তের জয় আর দক্ষিণ হস্তের ফুলটির পরাজয় মা।

লৌকিক ভাষায় জ্যোতিষের মন্ত্র। ঝার-ফুক, মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাসী লোকের কাছে জ্যোতিষ হনুমানের মন্ত্র এখানে

হয়েছে সজীব। গণনা করতে করতে জ্যোতিষ হনুমান গ্রামীণ ছড়া কাটে।

রাজার বাড়ী চুরি ডাকাতি
পুকুরের পাড়ে সিং
গাছের আগায় বিছানা বালিস
পাণিত পাড়ে নিন

মন্দোদরী হনুমানকে রসগোল্লা, পানিতাওয়া, চমচম খেতে বলে। উত্তরে হনুমান জানায় —

"না মা আমি এসব চিরাইতে পারব না। কারণ বুড়ো হয়ে গেছিতো দাঁতগুলো সব নড়ে গেছে।
তাই আমি বলছিলাম কি, আমার জন্য চাল ভাজা, কলাই ভাজা, পাঁপড় ভাজা এইসব খাইতে মজা।"

এ ধরনের কথাবার্তায় চরিত্রগুলি দর্শকের কাছে আপন হয়ে উঠে।

এই লোকনাটকে রামের কাছে রাবণের পরাজয়ের সময় রাবণের কাছে রামচন্দ্রের গুণকীর্তনের কথা নেই। রাজধারী লোকনাটকে রাবণের পরাজয়ের মধ্যে রাবণের আত্ম-নিবেদন আছে। রাম-বনবাস পালা নাটকে এরকম কোনো বিনয় রাবণের নেই। এই পালায় রামচন্দ্রের 'সীতা উদ্ধারই' কাহিনীর মূল বিষয়। তাই নাটকও শেষ হয় রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে।

গম্ভীরা

উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকনাটক গম্ভীরা। সারা বাংলায় লোকনাট্যের যত রকম ফর্ম দেখা যায় উত্তরবঙ্গে তার অনেকটাই পাওয়া যায়। কোচবিহার থেকে মালদহ পর্যন্ত ভূ-খণ্ডে এই লোকনাট্যগুলির অনেক রূপেরই প্রচলন আছে। তাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে গম্ভীরায় স্থান প্রথমদিকে। গম্ভীরা মালদহের লোকনাট্য। মালদহের পার্শ্ববর্তী দুই জেলা মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুরেও তার প্রচলন দেখা যায়। মালদহই এর কেন্দ্র স্থল। মালদহের সর্বত্র যেভাবে গম্ভীরার অনুষ্ঠান কিছুদিন আগেও দেখা যেত এখন ততটা নেই। নগর সভ্যতার বিস্তারের ফলে লোকসংস্কৃতির এই রূপগুলি কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং নবরূপে নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। লোকসংস্কৃতির শক্তি এখানেই যে তা নূতন পরিস্থিতিতে কিছু স্তিমিত হয়ে পড়লেও পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে। গম্ভীরা এখন উত্তরবঙ্গের ভদ্র সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গনে ও অভিনীত হচ্ছে। তাছাড়া কিছুটা সরকারী উদ্যোগের দ্বারাও তার পুষ্টিবর্ধন হচ্ছে। ফলে লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে মালদহে গম্ভীরা-গান গ্রামীণ সংস্কৃতিতে কিছুটা ক্ষীণ হয়ে পড়েও হৃতবল হয়নি। ড. প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ লিখেছেন বছর ত্রিশ চল্লিশ আগেও বাঙলার জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবের'' মত ধূমধামের সঙ্গে গম্ভীরার অনুষ্ঠান হত।[৪৭] এখন তার আয়তন কিছু সংকুচিত হয়েছে। বর্তমানে মালদহের ৮/১০ টি থানায় গম্ভীরার অনুষ্ঠান হয়। দুপাশের দুই জেলা ধরে মাঝে মালদহকে রেখে মোটের উপর গম্ভীরার প্রচলন কম নয়।

গম্ভীরা শব্দের অর্থ নিয়ে গবেষকেরা খুব স্পষ্ট কিছু নির্দেশ করতে পারেন নি। গম্ভীরা কথাটির অভিধানিক অর্থ বাড়ির ভিতরের কোনো স্থান অন্তঃপ্রকোষ্ঠ। গম্ভীরা শব্দটির ব্যবহার এই অর্থে চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায় 'গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসানিও প্রভুকে শোয়াইল'। গম্ভীরা এখানে বাড়ির ভিতরের কোনো ঘর। কিন্তু এই অর্থে গম্ভীরা কথাটি এখন চলেনা। শিবের মন্দির সংলগ্ন অংশকে গম্ভীরা বলে অভিহিত করা হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা শব্দের উৎস মূল আদি জনজাতির জীবনের মধ্যে খুঁজেছেন। শিবপূজার মণ্ডপকেও গম্ভীরা বলা হয়ে থাকে। সেই সূত্রে গ্রামীণ দেবতার পূজাস্থান অর্থেও গম্ভীরা শব্দের প্রয়োগ দেখেছেন পুষ্পজিৎ বাবু।[৪৮] এ থেকে বলা যেতে পারে শিবের পূজা উপলক্ষে গীত যে লোকনাট্য বা লোকগীত তাই গম্ভীরা। এখনকার গম্ভীরা গানের সঙ্গে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এরকম একটা সহজ অনুমানের কথা মনেই আসতে পারে। পুষ্পজিৎবাবু শিবপূজার একটি স্বতন্ত্র ধারার নাম গম্ভীরা পূজা বলে মনে করেন। শিবকে গম্ভীরও বলা হয়। পুষ্পজিৎবাবু গানে

এই গম্ভীরাপূজার মূলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রভাব সন্ধান করেছেন। প্রদ্যোৎবাবুর অনুমান তার পিছনে জাদুবিদ্যা ও তন্ত্র সাধানার প্রভাব আছে। তবু মোটের উপর একথা সকলেই স্বীকার করেন যে গম্ভীরা মূলে আছেন শিব

দেবতা। শিবপূজাই গম্ভীরা পূজার নাম নিয়েছে। এই শিবের পূজার পিছনে হয়ত প্রাচীন কোনো জনগোষ্ঠীর পূজা ও তন্ত্রাচারের প্রভাব আছে। প্রদ্যোৎবাবুর লেখা থেকে দেখতে পাই গম্ভীরা অনুষ্ঠানে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য করবার প্রথা বামনগোলা থানার কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে।[৪৯] আর গম্ভীরা পূজা বা গম্ভীরা বর্তমানের লোক সংগীত নাট্যের সঙ্গে যাদের যোগ তারা বর্ণ হিন্দু নন। এই পূজার সঙ্গে প্রধানত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও রাজবংশী সমাজের যোগ। ''মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর থানা এলাকা 'বরিন্দ' বা 'বরিণ' এলাকা নামে পরিচিত। এই এলাকায় রাজবংশী, দেশি, পলি, বাবুপলি, সাধুপলি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস। ...এই কোচ-ক্ষত্রিয় রাজবংশী-দেশি-পলি গোষ্ঠীর সম্মিলিত উৎসব হচ্ছে গম্ভীরা উৎসব।''[৫০] পরবর্তীকালে এই বরিন্দ এলাকায় বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জাতিধর্মের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। ''সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে, একসঙ্গে বসবাসের ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক মিলন মিশ্রণ ঘটেছে। দেশ বিভাগের পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এসে এ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। সংস্কৃতির আদান-প্রদান গ্রহণ-বর্জন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ব্রহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-কুণ্ড-তিলি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ও গম্ভীরাগানের অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সুফি মাস্টার (মহম্মদ সুফি), মেরাজ্জদ্দীন, শমীর খলিফা, আবছন মজিদ, সোলেমান ডাক্তার প্রমুখ গম্ভীরা শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।''[৫১]

গম্ভীরা উৎসব চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার দিকে অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক পূজা বর্তমানে শিবের সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে গম্ভীরা পূজা শিবের পূজা আর গম্ভীরা গান চড়ক উপলক্ষে শিবের পূজাকালীন সঙ্গীত। আনুষ্ঠানিকভাবে গম্ভীরা উপস্থাপনের একটা বিশেষ প্রচলন কাল রয়েছে। চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে যায় পর্ব অনুসারে উৎসব। 'গম্ভীরা' প্রাঙ্গণে পূজা, গান এবং নৃত্য — এই তিনটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চৈত্রের শেষ সপ্তাহের তৃতীয় দিন থেকে শুরু হয় 'ঘটভরা' উৎসব তারপরের দিন হবে ছোট তামাসা। এই ছোট তামাসার দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান ও নৃত্য বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে করবে। পঞ্চম দিনের দিন বড়রা নাচ-গান করেন। এই দিন নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার হয়। মুখোশ পরিধান করে মহিষাসুর নৃত্য, শিব-পার্বতী নৃত্য ইত্যাদি নৃত্যের পরিবেশন হয়। ষষ্ঠ দিনে কুশীলবগণ গ্রামের বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান করে করে গ্রাম পরিক্রমা করেন। এই পরিক্রমাতে সবাইকে আহ্বান করেন। তাই এই পর্যায়টির নাম 'বোলোবাই'। 'বোলোবাই' বা 'বোলোয়াই' শব্দের আঞ্চলিক অর্থ হচ্ছে কাউকে ডেকে আনা। অন্যদেরকে ডেকে ডেকে ঘটনার বিবরণী শোনানো। ঠিক এখানেই গম্ভীরা লোকনাটকের উৎস।

সপ্তমদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজাপাঠন এবং তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত

হয়ে থাকে। নতুন বৎসর থেকে শুরু হয় নতুন গান তৈরীর পালা। সমাজের গতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গম্ভীরা নাটক বিশেষ রীতির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সারাবৎসরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই লোকনাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।

বর্তমানে গম্ভীরা শব্দটি গম্ভীরা পূজা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে কেবল গম্ভীরা গান অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসলে শিবের গম্ভীর আখ্যাটি অপ্রচলিত হয়ে শিবকে স্থান ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু গম্ভীরা যে অর্থে লোকউৎসব বা লোকসঙ্গীত সেখানে শব্দটি প্রয়োগ অপ্রচলিত হয়নি। কাজেই গম্ভীরা এখন শিবপূজার সঙ্গে যুক্ত আবার তা থেকে বিশ্লিষ্ট একটি স্বাধীন লোক সঙ্গীত। "এ গীত এখন স্থানকাল মানে না, তাই আগের গম্ভীরা গীতের চেয়ে আজকের গম্ভীরার পূজা বিহীন গীতে সর্বজনীনতার ছাপ বেশি।"[৫২]

পুষ্পজিৎ রায় তাঁর 'গম্ভীরা' পুস্তকে গানের সঙ্গে বোলবাহি বা বোলবাই পালাধর্মী গানের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। 'বোলবাহি' খোট্টা ভাষার শব্দ, তার অর্থ আহ্বান করা। কোনো ব্যক্তিকে ডেকে আনা বা সম্ভাষণ জানানো। বামনগোলা হবিবপুরের কোনো কোনো গ্রামে একে কুৎসা বা কেচ্ছা অর্থে ব্যবহার করা হয়। বোলবাহি কেচ্ছা জাতীয় গান।[৫৩] গম্ভীরা গানে সেই বোলবাহি গানের প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। তিনি তাঁর 'গম্ভীরা'-তে যেভাবে গম্ভীরা পালাগানের পুনর্গঠন করেছেন তা বেশ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের ধর্ম হিসেবে কাহিনী নির্মাণ শক্তি ও কাহিনীর ক্রমবিকাশ ধর্মের কথা বলেছিলেন। কাহিনীর উপরে যুগপ্রভাবের কথা ও ছিল। চরিত্র ও বক্তব্যে যুগধর্ম ফুটিয়ে তোলার শক্তি লোকনাট্যের প্রধান শক্তি। তিনি 'খন' 'পালাটিয়া' ও 'রঙ পাঁচালি' কে প্রকৃত গ্রামীণ লোকনাট্য বলেছিলেন। বোলবাহিগান সম্ভবত তিনি দেখেননি। পুষ্পজিৎ বাবুর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় বোলবাহি গানে একদা খনেরই মতো লৌকিক বিষয় নিয়ে "গুপ্ত বা প্রকাশ্য ভাবে" যে সব "ন্যায় বিগর্হিত" কাজ হত সেই বিষয় নিয়েই গান করা হত।[৫৪] কাজেই বলা যায় লোকনাট্যের মূলধর্ম তা সেই গানে ছিল। কিন্তু ক্রমে সেই গানের রূপান্তর ঘটে। অবৈধ প্রণয় কাহিনী সম্ভবত সর্বসাধারণের নীতি ও রুচিবোধের উন্নতির ফলে এবং পুষ্পজিৎবাবুর মতানুযায়ী" জাতীয় চেতনার বিকাশের ফলে পরিত্যক্ত হয় এবং সেই পালাগানের সমাজ সমালোচনার অংশে সেই অনৈতিক ক্রিয়ার পরিচয় কিছুটা সংবৃত হয়ে পড়ে।[৫৫] গম্ভীরা গানে যে সমাজ সমালোচনা, ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে সমকালীন জীবনের বিচ্যুতি সম্বন্ধে সংগীত পরিবেশন করা হয় — তার মধ্যে পুরানো অনৈতিক ক্রিয়ার উপর বিদ্রূপ বর্ষণ ও সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ভূমিকাটি রয়ে গেছে। মানব সমাজের বহু পুরাতন রীতি ও আচার সভ্যতা বিস্তারের কারণে পরিবর্তিত হয়ে চলে — কোথাও তার সেই সূত্র পাওয়া যায় কোথাও পাওয়া যায় না। — নৈতিক মূল্যচেতনা এবং বিশেষত রুচিবোধের উন্নতির ফলে এই শ্রেণীর অবৈধ প্রণয়মূলক সংগীত কিছুটা পাল্টে যায়। সামাজিক কোন জাগরণ বা কোনো অন্যতম প্রভাব হয়তো এর পরিবর্তনে কাজ করে থাকে।

গম্ভীরার উৎস যাইহোক তার বর্তমান রূপে সেটিকে আর কেবল আনুষ্ঠানিক সংগীত বলা যায় না। অনুষ্ঠান নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে যে সর্বজনীন ধর্ম পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক আচারের সঙ্গে গানের যোগ প্রায় নেই। এ বিষয়ে প্রদ্যোৎ ঘোষ লিখেছেন "একদা গম্ভীরা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে সেই সম্পর্ক হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।"[৫৬]

গম্ভীরার আসর উত্তরবঙ্গের অন্যান্য লোকনাট্যের আসরের মতো দর্শকদের মাঝখানে বসে। চারিদিকে ঘিরে থাকে দর্শক — তার মাঝখানে প্রায় গোলাকার একটি প্রশস্ত জায়গায় আসর বসে। আসরের মাঝামাঝি প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে বসেন বাদ্যযন্ত্রীগণ। কুশীলবরাও তাদের সঙ্গেই বসেন। প্রয়োজন মত তাঁরা সেখান থেকে উঠে গানে বা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এরকমটা অন্যান্য লোকনাট্যেও দেখা যায়। আগে গম্ভীরা মণ্ডপ ফুল দিয়ে সাজানোর কথা অনেকে লিখেছেন। সদ্যফোটা পদ্ম ফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হত। তবে এখন আর তা দেখা যায় না। এখন সাধারণ সামিয়ানা দিয়ে তৈরি মঞ্চেই এ পালাগানের অভিনয় হয়।

গম্ভীরা পালাগানের বিষয়বস্তু প্রত্যহিক জীবনের নানা দিক নিয়ে গড়ে ওঠে। আশুতোষ ভট্টাচার্য একে বর্ষবিবরণীর গান বলেছেন। সমাজ জীবনের নানা ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কারো কোনো কাজের সমালোচনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক মতামত, কালের ধর্মানুযায়ী যুবক যুবতীদের আচার আচরণ, ফ্যাশন — অর্থাৎ যা কিছু একজন বীক্ষণশীল মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে তার সবই এর বিষয়বস্তুর মধ্যে গৃহীত হয়। ব্যক্তিগত ত্রুটির সমালোচনাও এর বাইরে নয়। রাজনৈতিক দলের মতামতগুলি ও এঁদের সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই সমালোচনার ক্ষেত্র থেকে কারো প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখানো হয় না। মানুষের কোনো আচরণ, পোষাক পরিচ্ছদ, বাবুয়ানা, মেয়েদের চালচলন, কারো কোনো আচরণের নিন্দা, স্ত্রী পুরুষের সাংসারিকতা, নারী শিক্ষা, সমাজে গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের উৎপাত, প্রমোটারের বাড়াবাড়ি এই সব বিষয়েই শ্রোতাদের মন বেশি আকৃষ্ট হয়। কাজেই এগুলিকেই গম্ভীরা গানে বিষয় হিসেবে পরিবেশন করা হয়। এ বিষয়গুলি গায়কেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বা কোনো সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করে গানের মধ্যে প্রয়োগ করেন।

গম্ভীরা পালা গানের একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পালার চারটি পর্যায়। প্রস্তাবনা, বন্দনা, চারইয়ারি ডুয়েট এবং রিপোর্টিং। পর্বগুলির নাম অবশ্য কেউ কেউ অন্য নামে দিয়েছেন। প্রদ্যোৎবাবু পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলেছেন —

(১) মুখপাদ (২) বন্দনা (৩) ডুয়েট বা চার ইয়ারি (৪) পালাবন্দীগান (৫) রিপোর্টিং

তিনি ডুয়েট বা চারইয়ারিকে একই সঙ্গে দেখিয়েছেন আর মুখপাদ ও বন্দনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সূচনা বা মুখপাদকে আমরা বন্দনা গানের প্রস্তাবনা অংশে রেখেছি। ডুয়েট ও চারইয়ারিকে দুটি আলাদা পর্যায় হিসেবে ভাগ করে দেখিয়েছি। এছাড়া প্রদ্যোৎবাবু যাকে পালাগান বলেছেন তাও গম্ভীরার একটি পর্যায়। তবে পালা গান এর অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ নয়। কাজেই পালাগান এর মধ্যে জোড়া যেতে পারে, আবার তা না জুড়লেও চলে।

প্রস্তাবনা অংশে দেখা যায় চারজন শিল্পী আসরে প্রবেশ করে নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। কথা বলতে গিয়ে তাঁরা তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। কিংবা বিভিন্ন লোকে তাঁদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে থাকেন এবং প্রতিকারের পথ খোঁজেন। যেমন আমাদের সংগৃহীত পালাগানে দেখা যায় —

প্রথম ব্যক্তি — হায় কি হলোরে ও কি করিরে, কি করি উপায়
বুড়াতি কালে প্যাটে পাথর,
অপারেশনের টাকা নাই

দ্বিতীয় ব্যক্তি — গণেশ বাবাজীর পায়ের তলায়
ঠুকছি মাথা সকাল সন্ধ্যায়
মাতালের বংশ ঘরে ঘরে যেন বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় ব্যক্তি — কারখানা বন্ধ কপাল মন্দ

চতুর্থ ব্যক্তি — পৌরভোট বছরে চারবার চাই
মরবেনা কেহ বিনা চিকিৎসায়
রাখবে রাজার হাল ব্যারাম হলে
হবু কমিশনার ভাই।

প্রদ্যোৎ ঘোষ যে 'মুখপাদ' অংশের কথা বলেছেন তাতে চরিত্রগুলি গান করতে এসে নিজের পরিচয় দেয়।[৫৭] এখানে চরিত্রগুলি নিজেদের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পুষ্পজিৎ বাবু লিখেছেন "সমস্যাগুলির সমাধান প্রসঙ্গে তুমুল তর্কবিতর্ক করতে থাকেন সমস্যা সমাধান করবার জন্য শেষ পর্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেব শিবকে আহ্বান জানান"।[৫৮] প্রস্তাবনা অংশের পর শিব চরিত্র মঞ্চে আসে।

বন্দনা অংশে শিবের বন্দনা এবং শিবের কাছে সমস্যার উপস্থাপনা হয়। বন্দনার রূপ নানারকম। পুষ্পজিৎবাবু সংগৃহীত একটি বন্দনা :

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়া শিবের গম্ভীরা বন্দ

আর বন্দ সরস্বতীর গান

বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম

দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ

কিন্তু এরকম আনুষ্ঠানিক বন্দনার সঙ্গে সঙ্গেই আসে শিবের কাছে সমস্যার উপস্থাপনা

কী করলি হে দশা দৈন্য

আজ দেশের লোকে পায়না অন্ন

ওরে হায় কি পস্তানার কথা

শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।

তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী

টাকায় আটমনের দর হইল হে

কুন্ঠে গেল সে মুখের দিন

হনুদিনে দিনে দীনের অধীন শিবহে।

এখন আট সেরের দর ছুটে না

প্যাটে দুবেলা ভাত জুটেনা

তোর নন্দী ভিরিঙ্গি বুড়া দামড়া

কি দিয়ে পূজব কহেক হামরা শিবহে।

আমাদের সংগৃহীত লোকনাট্যের এই বন্দনায় একেবারে একালের ছবি ধরা পড়েছে।

শিবহে

চারিদিকে শুধুই অন্ধকার

বছর বছর বন্যা খরা ভূমিকম্পে দিশাহারা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছারখার

প্রথম — তালিবাজ সরকার বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করছে বামিয়ার

শয়তানেরা করছে ভন্ডামি ধর্মের নামে

দেশের সম্মান বিসর্জিত, করছে ধর্মকে কলঙ্কিত

ভারতে হিন্দু তালিবান, দিয়েছে বর্বরতার প্রমাণ

দ্বিতীয় — ৫৩ বছর অতিক্রান্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন,
দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, মানুষ কর্মহীন।
কাটছে দিন অনাহারে, অপুষ্টিতে শিশু মরে
বহু গ্রামে পানীয় জল নাই, মরছে বিনা চিকিৎসায়
সাইবেরিয়ান বার্ডের মতন ভোট সিজিনে নেতার আগমন
ভাষণে কত প্রতিশ্রুতির জোয়ার।

তৃতীয় — ত্রাণের টাকা লোন স্যাংশন চলছে স্বজনপোষণ
চাকুরি কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে নেতাদের আপনজন
গ্রাম উন্নয়নের টাকায়, পঞ্চায়েত প্রধান কমিশন খায়...

মানুষের অভিযোগ নানারকম সময়ের ইতিহাসও এই গানের মধ্যে উঠে আসে।

যেমন — তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে যতো ইউরোপ মহাদেশে।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে এক হয়েছে জার্মানি আর রুশে।।

দেশের দুর্দিন সম্বন্ধে চিন্তা উঠে এসেছে একটি গানে

শিব হে —
হায়রে দেশ পাপে ভইর‍্যা, গেল সব মইর‍্যা
সাচ্চা নেতার পাল
ভোলানাথ কেমনে কাটি কাল।
স্বাধীনতার যত ফল খাই মিলে বেইমানের দল
দুর্নীতিতে কইর‍্যাছে বেহাল।

কিন্তু যার কাছে অভিযোগ সেই শিবের অবস্থাই তো ভালো নয়

শুন বুড়া সাচ্চা কথা বলব কি বলব নাহে
বলব না
তোমার ভাব দেখে মনে হতেছে ভাবনা হে
বাড়ীঘর দিয়া ছাইড়া, শ্মশানেতে রহ পইড়্যা
তুমি সাজিছ বৈরাগী, সঙ্গে লিয়া মাগী হে,
শিঙ্গ ডুমুর হাতে, বেড়াও বুড়া ভূতের সাথে
খাহো গাঁজা আর ভাঙ মুখে বাবাম বাবাম হে।[৫৯]

সমবেত আহ্বানে শিব এসে উপস্থিত হন

এইসব অভিযোগ শুনে শিব বলেন

শিব — ঠিক আছে, তোমাদের যা দুঃখ আছে সব খুলে বল, আমি নোট করে নিয়ে যাব। তোমাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব।

শিবের এই উক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। শিব চরিত্র সম্বন্ধে এখানে একটি দুটি কথা বলা দরকার। শিব সেজে এখন যিনি স্টেজে উপস্থিত হন, তাঁর মেকআপ শিবের মত। পরনে বাঘছাল হাতে ত্রিশূল। শিব চরিত্রকে সামনে রেখেই প্রজাদের এই সব অভিযোগ এবং শিবের কাছে সমাধানের জন্য আবেদন। কিন্তু গম্ভীরাগানে শিবের উপস্থিতি খুব বেশি দিনের নয়। বড় জোর ৬০/৭০ বৎসর। এ বিষয়ে প্রদ্যোৎ ঘোষ যা বলেছেন তার মর্মার্থ দাঁড়ায় :

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাঙলার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একবার মালদহ আসবার কথা ছিল। স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহম্মদ সুফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের সম্মুখে গম্ভীরা গাইবেন ঠিক করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত স্যার আশুতোষ মালদহে আসতে পারেননি। মোহম্মদ সুফী তবু শিবকে উপস্থিত করে গান গেয়েছিলেন —

হে দ্যাখ, হো দ্যাখ কারে ডাকতে

কেডা আইল ভাইরে,

ইনি কি স্যার আশুতোষ ? হাইকোর্টের জজ

গায়ে জামা কেন ছাইরে।

এই উপস্থাপনা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়। ফলে পরবর্তীকালে গম্ভীরায় শিবকে উপস্থিত করবার রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যায়। প্রদ্যোৎবাবুর এই খবর থেকে জানা যায় শিব চরিত্র উপস্থাপনা ৬০/৭০ বছরের বেশি নয়। কিন্তু এরই মধ্যে সমাজব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার পরিচয় শিব চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন প্রথম যুগে শিব ছিলেন ভূস্বামী শ্রেণীর প্রতিনিধি। আর এখন তিনি মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতা। সমাজের যেসব দিকে সমস্যা যেগুলি শিবের নজরে আনা হয়। প্রজারা দুঃখের কথা বলে।

জনগণ — ত্রিশ ভাগ লোক শিক্ষিত আর সত্তর ভাগ অশিক্ষিত। তাও ত্রিশভাগ লোকের মধ্যে সহি করতে কলম ভাঙ্গা দিবে। এই যে শিক্ষায় অবনতি এদিকে নজর দাও।

শিব — কেন, হামিত শিক্ষার জন্য নন-ফর্মাল, নাইট-স্কুল

এ গিলা সব চালু কর‍্যাছি, শিক্ষার উন্নতির জন্যে।[৬০]

এরই মধ্যে আসে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, ঘূর্ণিঝড়, কখনো বা ভোটে রিগিং-এর অভিযোগ, কংগ্রেস তৃণমূল মহাজোট গঠন প্রসঙ্গ এবং আরো নানা বিষয়। শিব তো প্রজাদের অভিযোগ নোট করে নিয়ে যান, সমাধানের চেষ্টা করবার আশ্বাস দেন। এবং পাকা রাজনৈতিক নেতার মতো বলেন —

" তোমরা আমার পাশে থাক, আমি সব সমস্যার সমাধান করে দিব।
এবার যদি ক্ষমতা ফিরে পাই, তাহলে সব সমস্যার সমাধান করে দিব।"[৬১]

শিবের এই উক্তিতে একালের রাজনীতিক নেতার উচ্চারণ শোনা যায়। ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যই শিবকে মাঝে মাঝে 'জনগণের' কাছাকাছি আসতে হয়। একথা জনগণও জানেন। তাঁরা গান গেয়েছেন —

"সাইবেরিয়ার বার্ডের মতন,
ভোট সিজিনে নেতার আগমন
ভাষণে কত প্রতিশ্রুতির জোয়ার।"

কাজেই জনগণও জানেন শিবের ক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রয়োগের সীমানা কতোটা। উভয় পক্ষই এখন উভয়কে চেনেন। গম্ভীরায় সেই গল্পটাই যেন উঠে আসে। আসলে প্রতিদিনের বাস্তব জগৎকে এই শিল্পীরা যেভাবে চেনেন — তাকেই কিছুটা বিদ্রূপাত্মক ভাবে প্রকাশ করেন।

চারইয়ারি —

চারইয়ারি অংশে চারজন বক্তার কথোপকথনের মাধ্যমে সাময়িক প্রসঙ্গের সমালোচনা করা হয়। এখানে কোনো সম্পূর্ণ কাহিনী থাকে না, থাকে এক একটি সমকালীন বিষয়। কখনো রিগিং, সন্ত্রাস, কখনো মহাজোট প্রসঙ্গ, কখনো আবার কীভাবে লোককে ঠকিয়ে অর্থবান হওয়া যায় তার কথা, প্রোমোটারি, কন্ট্রাকটরি, পণপ্রথা, কৌলিন্য, নূতন শিক্ষিত শ্রেণীর নীতিহীনতা, সাম্প্রদায়িক সংহতি নানা বিষয় এর মধ্যে থাকে।

চারইয়ারিতে চারজনের মধ্যে তিনজনের নিজের নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের পর সেই বক্তব্যগুলিকে উচিতার্থে চতুর্থ ব্যক্তি বিশ্লেষণ করে বক্তব্য পেশ করবেন। সেইজন্য এই ব্যক্তিকে বলা হয় উচিত বক্তা। চারইয়ারীর একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে —

প্রথম বক্তা — বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মহাজোট চেয়েছিলাম, ঝঞ্ঝাট চাইনি জোটের নামে।

দ্বিতীয় বক্তা — রিগিং সন্ত্রাস করেছে সিপিএম তৃণমূল সমানে।

তৃতীয় বক্তা — রিংগিং সন্ত্রাস করে বামফ্রন্ট এল সরকারে।

চতুর্থ বক্তা — নাচতে না জানলে পরে বাঁকা হয় উঠান, বারে বারে তুলিস হেরে রিগিং-এর স্লোগান। নির্বাচনে — টি.ভি., পেপারে, বামফ্রন্ট প্রতিবারই হারে। পত্রিকা টি.ভি. বানায় হিরো, ফলাফলে দেখি জিরো। তহেলকা সম্বন্ধে তোদের মুখে কোন কথা নাই, ডুবালি জলে পা দিয়ে দু'নৌকায়।

... ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার, রাইটার্স দখল করতে সংগঠন দরকার।

ডুয়েট — চারইয়ারী উপস্থাপনের পরের পর্যায় হলো ডুয়েট। ডুয়েট শব্দটিতেই বোঝো যাচ্ছে দু'জন অভিনেতার কথা। দু'টি চরিত্রের মধ্যে একজন সাধারণত: স্ত্রী চরিত্র। তবে কখনো কখনো দুজন পুরুষের মধ্যেও ডুয়েট হতে পারে। এখনও পুরুষ স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। তবে সংগতকারদের মধ্যে এখন স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিবেশনেরও রেওয়াজ চালু হয়েছে। ডুয়েটে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর প্রতিদিনের সমস্যার কথাই প্রকাশ পায়। স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনের ডুয়েট অংশে নানা ঘরোয়া প্রসঙ্গ উঠে আসে। কথোপকথনের ভঙ্গিতে তা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

স্ত্রী : আমি তোমাকে বিয়ে করে মরলাম জ্বলে পুড়ে / না জেনে শুনে বিবাহ বন্ধনে হলাম আবদ্ধ/কত ভাল পাত্র দিলাম ছেড়ে।

পুরুষ : তোমার বাবা এসেছিল বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, দিনে শতবার বাবার পায়ে যেত তেল মাখিয়ে, বাড়ীর মাটি দিয়েছিল বসিয়ে, বাবাকে সোজা পেয়ে তোমার বাপে মায়ে দিল গছিয়ে, এমন রণচণ্ডি আমার ঘাড়ে।

স্ত্রী : রিহার্সালে কর তোমার ষাঁড়ের মতো চিৎকার, শিল্পীবন্ধুদের জন্য চা করে দাও তিনবার, যেন কেনা দাসী। তোমার পানের পিকে পোড়া বিড়িতে ঘর করে একাকার, চলবে না সব ঐ ঘরে, সব ফেলব ছুড়ে।

পুরুষ : তোমার ভাই, বোন, দাদা পরিজন আত্মীয় যত, আমার বাড়ীকে করেছে হোটেলে পরিণত, এখানেই আব্দার যত। সম্মানের খাতিরে, বিছানা ছেড়ে, ঘুমাই মেঝেতে। আমিও দেব এবার বের করে।

স্ত্রী : পরনিন্দা, পরচর্চা এইতো গম্ভীরা

ছেড়া কাপড়ে রাস্তার ধারে
গায় ছোট-লোকেরা
শোনেন ভদ্র যারা
অসভ্যের মতন, তোমাদের নাচন, কি বিচ্ছিরী ভাষা
নাই মান সম্মান এই কালচারে গম্ভীরা দাও ছেড়ে।

পুরুষ : এই পোষাক, ভাষা, নৃত্য আর গম্ভীরা গানে। আঘাত হেনেছিল ভারতে বৃটিশ শাসনে, গম্ভীরা শিল্পীগণে। সুভাষচন্দ্র, কবি রবীন্দ্র মণীষীগণের গম্ভীরা কেটেছিল দাগ অন্তরে।

স্বামী স্ত্রীর ডুয়েট অনেক সময় অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। সংসারে অভাব স্ত্রী চাকরি করতে চায়, স্বামী স্ত্রীকে চাকরি করতে দিতে চায় না। তার একটি চিত্র পুষ্পজিৎ রায় তাঁর 'গম্ভীরা' বইয়ের ১০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন।

স্ত্রী — দেখ সংসারে তো বড্ড অভাব।

পুরুষ — এই কথায় কি চাহিস জবাব।

স্ত্রী — হুকুম দাও তো চাকরি করি।

পুরুষ — তোর চাকরির ঠোকনা মারি।

স্ত্রী — তুমি আমার কথা লাও না ধরে

পুরুষ — দূর কাহা যাবি ঘরের কাজ ছেড়ে

স্ত্রী — যদি কেলেক্টারির হই কেরানি

পুরুষ — তখন হবি মানির বেটি মানি

ভাত তরকারি বাঁধবো ধনী

তুমি করবা মালিকানা

স্ত্রী — স্পেশাল কেডারের যদি চাকরি পাই।

পুরুষ — চেংরা পেংরার ঘি থাকবে না মাথায়,

শুধু দেখবে তোকে পড়বে কি ছাই

ফেল ছাড়া পাশ করবে না।

স্ত্রী — ডিউটি দিব রাইফেল ধইরে

পুরুষ — তবে চোর দেখে খুব যাবে বাইরে,

রাইফেল কুনাও নিবে কাইড়ে

তোকেও খুঁজে পাবো না।

স্ত্রী — খেলব টেনিস ফুটবল হকি

পুরুষ — তোর মাথাতে ঢুইকেছে কি,

খেলওয়াড়রা করবে ধাক্কাধাক্কি

ফাউল ছাড়া গোল করবে না।[৬২]

এসব প্রসঙ্গ সমাজ মানসিকতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। একদিকে আর্থিক চাপ অন্যদিকে পুরুষের স্ত্রীকে ঘরে রাখার ইচ্ছা — এবং মেয়েরা বাইরে চাকরি করতে গেলে তার সম্ভাব্য পরিণাম এসব বিষয়ের উদ্বেগ বাড়ে। লোককবির রসিকতার মধ্যে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

'ডুয়েট' প্রদর্শন শেষ হলে কোনো কোনো গম্ভীরা নাচদল 'টনটিং' বলে আরেকটি পর্যায় উপস্থাপিত করেন।

'টনটিং' আর কিছুই নয় — এ শুধু কারো কার্যকলাপকে বিদ্রূপ করা। সামাজিক রাজনৈতিক বা পারিবারিক কোনো কার্যকলাপ নিয়ে দুটি চরিত্র বিদ্রূপ করে, গান এবং কথা দিয়ে দর্শক শ্রোতাকে বোঝাতে থাকবেন। এই চরিত্রগুলিকে আবার বলা হয়ে থাকে উচিত বক্তা। সমাজের কর্তাদের কিংবা দেশের নেতাদের যে কোনো কর্মকে কেউ ভালোভাবে না নিলে তাকে বিদ্রূপের আকারে এখানে পরিবেশন করা হয়।

প্রথম বক্তা : বেকারত্ব ঘুচবে ভারতে মন্দির নির্মাণ হলে,
কাজকর্ম আর উন্নতির পথ ভারতে যাবে খুলে,
চুরি ছিনতাই করবো, টাকা লুটবো
মন্দিরে গেলে ক্ষয় সর্বপাপ

প্রথম চরিত্রের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চরিত্র গান ও কথার মধ্য দিয়ে বিদ্রূপ করবেন।

দ্বিতীয় বক্তা : অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলি নির্বাচনে
তোদের স্পর্শে সাধু হল লম্পট গুন্ডাগণে
টাকা কামালো গুরুয়া গরলা ভন্ডামী করাই তোদের স্বভাব।
দাপরযুগে আবির্ভূত কৃষ্ণ অবতার, ইকাল করব পূজা হব রাজা থাকবে না ঘরে অভাব।

তৃতীয় বক্তা : ভারতবুকে আদিবাসী আর হরিজনে,
উচ্চবর্ণের লোকেরা মারছে পুড়িয়ে জ্বলন্ত আগুনে
কেন প্রতিবাদ নাই, হরিজন হওয়ায়,
নাইকো তোদের অনুতাপ।

এইভাবে প্রথমবক্তার বক্তব্যকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তা তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করে উপস্থাপন করে থাকেন।

টনটিং এর একটি পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'অর্থমন্ত্রীজি আপকো শ' সেলাম
জনতা কো দিয়া আজব ইনাম
আপকা বাজেট বহুত খাসা
পুরাহোগা মনকা আশা
অমর রহেগা আপকা নাম।'

— লক্ষণীয় এই গানের ভাষা হিন্দি, কারণ অর্থমন্ত্রী হিন্দিভাষী। বাজেট প্রসঙ্গে

প্রথম বক্তার কথা — বাড়ী ঘর বেচা কিনব মারুতি গাড়ী
ঋত্বিক হবো, ঘুরবে কত, পাশেতে সুন্দরী
ঘুর ঘুর করবে কত ছুঁড়ি
নাচন কুদন করব কত,
হিন্দি সিনেমার মত
মুখে গাইব কহনা পিয়ার হ্যায়ের গান।

দ্বিতীয় বক্তা — ভর্তুকী বন্ধ, কৃষিতে আমদানি শুল্ক হ্রাস,
ডিজেল সারের বাড়ছে দাম কৃষকদের বাঁশ
ভারতে কৃষির সর্বনাশ
শুদ্র পাঞ্জাব হরিয়ানায়
আত্মহত্যায় জীবন যায়
তোদের কাছে নাই চাষী জানের দাম।

তৃতীয় বক্তা — সোনাহীরা ফ্রিজ সস্তাতে পাব এবার
গলাতে পরাব বৌকে হীরার হার
সর্বাঙ্গে সোনার অলংকার
ফ্রিজেতে রাখব তুল্যা ফলের জুস আর পেপসি কোলা
ভারতবাসী অতি ভাগ্যবান।

গম্ভীরা গানের শেষ পর্বটির নাম রিপোর্ট। 'রিপোর্ট' আর কিছুই নয় দর্শকদের কাছে সারা বৎসরের ঘটনার বিবরণ দেওয়া। এই অর্থে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা গানকে বর্ষবিবরণী বলেছিলেন। এই পর্যায়ে শিব দেবতাকে ডেকে এনে দেশের সারা বৎসরের কথা রিপোর্ট করা বা বিবরণ দেওয়া হয়। নানান সমস্যার কথা শিবকে শুধু বলাই নয় শিবকে কৈলাশে প্রস্থান করার আগে সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিতে হয়।

'রিপোর্ট' শুরু হতেই শিল্পীরা গেয়ে ওঠে একটি গান। এই গানের মধ্য দিয়ে তাদের দল এবং সাহসের কথা প্রতিফলিত হয়।

নানা হে,

আমরা সদর্পে গম্ভীরা গাই

করব না মাথা নত, কাপুরুষের মত

গোবিন্দ গোপীনাথ বলেছে তাই।

গানের শেষে দুটি চরিত্র মূলত: মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিবকে 'নানা' সম্বোধন করে প্রতিবেদন পেশ করেন।

১। শিব কহে দে উপায়

হামরা বাঁচি কী প্রকারে

মোদের ইস্তক বিস্তি কাবার হইল

ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে

আর ধীরেনবাবু ফেনসি ড্রেসে

টাউনে নাম জারি

আর মজা মারে প্রথম ডাক্তার

কামিয়া গোঁফ দাড়ি।[৬৫]

২। বলবো কী গান ওহে শিব বাগানে নাই আম

গাছে গাছে বেড়িয়া দেখছি নূতন পাতা সব সমান।

মনে মনে ভাবছি বন্যা কাজের কোনো পায়না দিশা

তেল ধান চাটলের দর খুব কলা ভূয়ার বেশী দাম।[৬৬]

৩। আপ্পায়ারা পিল্ল রিপোর্টার

তেপান্ন বছর বয়স তার

হোটেলে বিদেশিনী বুড়ার জাগালো শিহরণ

রসে পরিপূর্ণ বুড়ার যৌবন, সুন্দরীর জন্য আত্মহারা

হোটেল কর্তৃপক্ষ বুঝল না দুঃখ

বুড়াকে দিল বিদায়। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

৪। নাতীর চাকরী করার সখ

দিদিমা টাকা দিতে নারাজ

দিদিমার সোনার দাঁতের প্রতি,

নাতির লোভ হলো অতি,

এক বক্সিং মারল কস্যা
সোনার দাঁত গেল খস্যা
দিদিমা গেল স্বর্গধামে
নাতি গেল জেলখানায়। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

৫। রাজনৈতিক দল, দেশে প্রবল
মালিকশ্রেণী পুঁজিপতির দল
সুখী নয় কেউ, তাই অন্তর্দ্বন্দ্ব
দেখে অবস্থা কয় গোবিন্দ
না হলে বন্ধ অন্তর্দ্বন্দ্ব
স্বাধীনতায় কোনো সুখ নাই। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

৬। মন্ত্রী, এম.এল.এ., এম.পি.গণ
ভোট দেয় মুখের মতন
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
ভুল ভোট দেয় ৬৭জন
স্বনামধন্য মন্ত্রী এম.এল.এ.
ভারতের সুনাম বাজায়। (নির্বাচিত সংকলন থেকে উল্লেখিত)

রিপোর্ট পর্বে সম্বৎসরের নানা বিষয় নিয়ে গান করা হয়। শিব সে সব গান শোনেন। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রাস্তার অবস্থা, মেয়েদের ফ্যাশন, লোডশেডিং, শিক্ষা, চাকরি কোনো কিছুই এর বাইরে নয়। এই সব বিবরণ দেখে একে বর্ষবিবরণী নাম দেওয়া সার্থক বলেই মনে হয়। গম্ভীরা গানের মধ্যে লোক সাংবাদিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গম্ভীরা গানে রিপোর্টিং হয় রঙ্গ ব্যঙ্গের ঢং-এ। এই হাস্য পরিহাসের মধ্যে দেশের অবস্থার পরিচয় তুলে ধরা হয়। লঘু কৌতুক বা বিদ্রূপের ঢং ব্যবহার করবার ফলে শ্রোতাদের কাছে তার আবেদন বেশ সরস হয়ে পৌঁছায়। উপরন্তু তাতে সমালোচকের সচেতন মন ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে রঙ্গ রসিকতা ও নীতি মূল্য দুইই তাতে পাওয়া যায়। ঠিক একইরকম না হলেও চড়ক উপলক্ষে অনেক জায়গায় হ'ত। এই সঙগুলিও হ'ত কোনো অনৈতিক প্রণয় বা কোনো লোকসমাজের প্রসঙ্গ নিয়ে। তারও লক্ষ্য ছিল সমাজ সমালোচনা ও মনোরঞ্জন।

এই সকল রিপোর্ট করার পর পূর্বের ডুয়েটের মতো দু'টি চরিত্র এখানেও ডুয়েট প্রদর্শন করে থাকেন। এই

ডুয়েটে স্বামী-স্ত্রীর ঘরোয়া সমস্যাই হালকা-লঘুচালে গানের আকারে প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টিং পরিবেশনের মধ্যে প্রদর্শন বৈচিত্র্য আনার জন্য কুশী-লবরা এটা করে থাকেন। পুনরায় রিপোর্টিং শুরু হয়।

১। গর্ভে আসে যদি সন্তান,
করো অন্য গর্ভে চালান,
যখন ভূমিষ্ঠ হবে,
কাকে মা বলে ডাকবে,
গর্ভ যন্ত্রণা সইতে হবে না,
বিনা কষ্টে মা হওয়া যায়।

২। আশ্চর্য খবর শুনলাম ভাই,
পুরুষ মাইয়া হইয়া যায়।
শুন্যা লাগছে ভীষণ ভয়,
কপালে যদি এমন হয়,
তখন বলবে না বউ প্রাণনাথ,
দুজনারই স্বামী নাই।

৩। সাঁইবাবার কন্যা হলে,
সোনাদানা চাকরী মেলে,
ইঞ্জিনীয়ারকে দিল উপহার
হাত ঘুরিয়া সোনার হাত
মন্ত্রী সন্ত্রী ছিল যত, অলৌকিক ঘটনায় অভিভূত
বাবাজীর ধান্দাবাজী, আর কার সাথী
ধরা পড়ল টি.ভি. ক্যামেরায়।

রিপোর্টিং-এর প্রায় শেষে অভিনেতাগণ শিবকে খোঁচা দিয়ে আবার 'বন্দনা'র মধ্যে সজাগ করে দেন। (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

১। বল না কি দোষ কর‍্যাছি ভোলা
চোখ নাই কেনে হামাদের বেলা
বুনছিস মরণ জাল, খ্যায়া কলাচাল

গাঁচাতে দিচ্ছিস ঠ্যালা।

ষাঁড়ে চড়্যা বেরাস ঘুর‍্যা, পর‍্যা বাঘ-ছাল হে,

সিদ্ধি গাঁজা খ্যায়া দু'চোখ কর‍্যাছিল লাল হে,

ত্রিশূল হাতে শ্মশানেতে, ছাই ম্যাখা গোটাগায়েতে

নন্দী-ভিরিঙ্গি সঙ্গে — মেতেছিস তুই রঙ্গে

কত রসরঙ্গে নানীর সঙ্গে খেলেছিস তুই প্রেমের খেলা (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

২। শিব হে :

শুন বলি ওহে ভোলা চলছে হত্যালীলা,

বিশ ধুকছে দেখ্যা কাণ্ড-কারখানা

স্বভাব যায় না মোলে, ইজ্জত যায় না ধুলে

গুজরাট দাঙ্গা তারই নমুনা (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

৩। স্বাধীনতার স্বাদ বড়ুই তিতা দিন কাটছে অনাহারে —

শিবহে, কোটি কোটি টন খাদ্য শষ্য পচছে গুদাম ঘরে

বাজেট পাশ একবার বছরে মূল্য বৃদ্ধি বারে বারে (গম্ভীরা, নির্বাচিত সংকলন)

শিবকে সামনে রেখে দেশের সমাজের নানাবিধ বিবরণ পেশ করেন অভিনেতাগণ। 'গম্ভীরা' অনুষ্ঠান অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। এখন তার মধ্যে ফুটছে আধুনিক সমাজের কথা। এখন গম্ভীরার কুশীলবরাও আর বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মানুষ নন। এক সময় মালদহ জেলার দেশী-পলি-রাজবংশী-কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্য থেকে এই লোকনাটকের সৃষ্টি হয়েছিলো। এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে এই সকল শিল্পীর দৃষ্টিতে সমাজ ও দেশের সমস্যাবহুল যেসব ছবি ধরা পড়ে তারই রূপায়ণ ঘটে গম্ভীরায়। শিল্পীদের শতছিন্ন মলিত বেশ প্রতীকীচিত্রকেই উপস্থিত করে। তাঁরা বঞ্চিত পীড়িত হত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি দেবতার দরবারে তাঁদের নালিশ জানাতে আসেন। যার কাছে তাঁদের নালিশ তিনি তাঁদেরই মতো দরিদ্র নিঃস্ব। কিন্তু সেই দেবতারও কিছু পরিবর্তন গানের গহনে ঘটে গেছে।

এখন নানা শ্রেণীর মানুষ এই গানে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের প্রধান অংশই কৃষি নির্ভর। দেশের জনগণের মানুষের হয়ে নিজেও ছিলেন পোষাকে চরিত্রে। গম্ভীরা এভাবেই মানুষের কথা বলে, মানুষের পরিবর্তনের কথা বলে — সময় ও সমাজের নষ্ট চরিত্রকে উন্মোচিত করে তাকে...

তথ্যসূত্র

১। বাংলার লোকসংস্কৃতি, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ১৩৬।

২। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, পৃ: ১৩৬।

৩। কুশান গান, দ্বিজেন্দ্র ভকত, পৃ: ২৫।

৪। নট নাট্য নাটক, সুকুমার সেন, পৃ: ২৫।

৫। কুশান গান, দ্বিজেন্দ্র ভকত, পৃ: ১।

৬। Indian Folk Music, Bhawaiya, Ethnomusicological Study, Dr. Sukhbilash Barma, p.261.

৭। ভাওয়াইয়া, সুখবিলাস বর্মা, পৃ: ২৩৫।

৮। বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, গিরীন্দ্রনাথ দাস, পৃ: ৩৬৬।

৯। কোচবিহারের ইতিহাস, খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ: ৬৯।

১০। তদেব, পৃ: ৬৬।

১১। ভাওয়াইয়া স্মরণিকা-২০০৭, শ্যামাপদবর্মণ, পৃ: ৫৩।

১২। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১০৭।

১৩। গ্রামীণ বাংলা লোকনাটক (সম্পাদিত), সনৎ কুমার মিত্র, পৃ: ১৫৮।

১৪। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১০৮।

১৫। স্মরণিকা, লোকসংস্কৃতি উৎসব, ১৯৮৩, পৃ: ৩১।

১৬। গ্রামীণ বাংলা নাটক (সম্পাদিত : সনৎ কুমার মিত্র), বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৫২।

১৭। তদেব, পৃ: ১৫৮।

১৮। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা, বীরেন্দ্রনাথ রায়, পৃ: ৯০।

১৯। তদেব, পৃ: ৯১।

২০। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১০৮।

২১। তদেব, পৃ: ১১০।

২২। তদেব, পৃ: ৬৭।

২৩। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা, বীরেন্দ্রনাথ রায়, পৃ: ৯১।

২৪। তদেব, পৃ: ১০৮।

২৫। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ১১০।

২৬। তদেব, পৃ: ৬৯।

২৭। তদেব, পৃ: ৭০।

২৮। তদেব, পৃ: ৭১।

২৯। তদেব, পৃ: ১১০।

৩০। তদেব, পৃ: ১১১।

৩১। তদেব, পৃ: ২৭৮।

৩২। তদেব, পৃ: ২৭৯।

৩৩। বৈতানিক, তরাইয়ের প্রাণ লাহাংকারী গান, পরেশচন্দ্র রায়, পৃ: ১১।

৩৪। তদেব, পৃ: ১৫।

৩৫। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৭০।

৩৬। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, শিশির মজুমদার, পৃ: ২৫৭।

৩৭। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ২৭৯।

৩৮। ভাওয়াইয়া, সুখবিলাস বর্মা, পৃ: ২৪৫।

৩৯। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৪৬৬।

৪০। নট নাট্য নাটক, সুকুমার সেন, পৃ: ৯৬।

৪১। তদেব, পৃ: ৯৬।

৪২। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, শিশির মজুমদার, পৃ: ৪০।

৪৩। তদেব, পৃ: ৩৯।

৪৪। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ: ৩৭৯।

৪৫। তদেব, পৃ: ২৭৩।

৪৬। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, শিশির মজুমদার, পৃ: ৫৭, ১০৮, ১৪৪, ১৯৫, ২৩৮।

৪৭। গ্রামীণ বাংলা নাটক (সম্পাদিত : সনৎ কুমার মিত্র), গম্ভীরা, পৃ: ৬০।

৪৮। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ১৩।

৪৯। গ্রামীণ বাংলা নাটক, সনৎ মিত্র সম্পাদিত, পৃ: ৫৯।

৫০। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ১৭।

৫১। তদেব, পৃ: ২০।

৫২। তদেব, পৃ: ৬০।

৫৩। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ২৬।

৫৪। তদেব, পৃ: ২৬।

৫৫। তদেব, পৃ: ২৮।

৫৬। তদেব, পৃ: ৬৩।

৫৭। তদেব, পৃ: ৬৪।

৫৮। গম্ভীরা, পুষ্পজিৎ রায়, পৃ: ৩১।

৫৯। তদেব, পৃ: ৯৬।

৬০। তদেব, পৃ: ৯৯।

৬১। তদেব, পৃ: ১০২।

৬২। তদেব, পৃ: ১০৬, ১০৭।

৬৩। তদেব, পৃ: ১২৩।

৬৪। তদেব, পৃ: ১২৫।